ইমাম
ইবনে তাইমিয়ার
সংগ্রামী জীবন

আবদুল মান্নান তালিব

ভূমিকা

শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন যুগস্রষ্টা। হিজরাতে নববীর অর্ধ সহস্রাধিক বৎসর পর নবূওয়াতের স্বচ্ছ ঝরণা ধারায় যেসব ময়লা আবর্জনা মিশে গিয়েছিল দীর্ঘ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে তিনি তাকে আবিলতা মুক্ত করেন। তাঁর ইল্‌মের খ্যাতি সুদূর মাগরিবের কাইরোয়ান থেকে পূর্বে চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর প্রভাবও এইসব এলাকাকে প্লাবিত করেছিল।

সপ্তম অষ্টম হিজরী শতকে ইবনে তাইমিয়া ছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নাম। তিনি সংগ্রাম করেন শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে। তিনি সংগ্রাম করেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে, জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাঁর নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে অমিততেজা রাজশক্তির হৃদয়ও কেঁপে ওঠে। দুর্জনদের পরামর্শে পরাক্রান্ত রাজশক্তি তাঁকে লৌহ কপাটের অন্তরালে নিক্ষেপ করে। কারাগারে বসেও তিনি লেখনী চালাতে থাকেন অতি দ্রুত বেগে। তাঁর নির্জলা সত্যের প্রকাশে কারাপ্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিরোধী পক্ষ হিংসার আগুনে তাঁকে পুঁড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে চায়। এবার রাজাঁর হুকুমে তাঁর কাছ থেকে বইপত্র, খাতা কলম, কালি দোয়াত সব কিছুই ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবুও তিনি দমেননি। ছেঁড়া টুকরো কাগজ জমা করে কয়লা দিয়ে তাতে লিখতে থাকেন। এভাবে সত্যের নির্ভীক সেনানী আমৃত্যু লড়ে যেতে থাকেন অসত্যের বিরুদ্ধে।

তাঁর সাত্‌ষট্টি বছরের জীবনকাল ছিল মিথ্যা ও বাতিল, অন্যায় ও অসত্যের ন্যাক্কারজনক পরাজয়ের ইতিবৃত্ত। ইবনে তাইমিয়ার খুরধার লেখনী আজও মিথ্যা ও বাতিলের পরাজয়ের কাহিনী লিখে চলছে।

কুরআন ও সুন্নাহ্ হচ্ছে ইসলামের সত্য জ্ঞানের দুটি মূল উৎস। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে আবার এই মূল উৎস দুটির সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে যান। এ জন্য তাঁর সমস্ত ইলমী যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেন। এ পথে তিনি কোন দোর্দণ্ড প্রতাপ শাসক ও অসীম ক্ষমতাধর

প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুকে একটুও আমল দেননি। সত্যের জন্য তাঁর এই অকুতোভয় সংগ্রাম ও সাধনা কিয়ামত পর্যন্ত এই মিল্লাতকে জীবনীশক্তি যোগাতে থাকবে।

ইবনে তাইমিয়ার মতো মনীষী তাই যেমন হাজার বছরে জন্মে তেমনি হাজার বছরেও তার মৃত্যু হয় না।

বাংলা ভাষার এই মহান মনীষীর সংগ্রামী জীবনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়নি বললেই চলে। এই মহান মনীষীর জীবন ও কার্যক্রমের ওপর দৈনিক সংগ্রামে 'ইতিহাস অম্লান' শিরোনামে আমার প্রকাশিত লেখাগুলো এখানে যুথিবদ্ধ করে দিলাম মাত্র। ইমামের তাজদীদী কার্যক্রম আরো বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে দিকে অগ্রসর হতে বিরত থেকেছি। তবে মোটামুটি ইমামের জীবন ও তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর একটা চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। পাঠক সমাজ এ থেকে সামান্য উপকৃত হলেও আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

তবে পাঠক সমাজের কাছে আবেদন, একজন ইসলামী সংস্কারকের জীবন ও কার্যক্রম পর্যালোচনার সময় তাঁরা পূর্নাংগ ইসলামী দৃষ্টিভংগির প্রতি পুরোপুরি গুরুত্ব আরোপ করবেন। আর এটিকে নিছক একটি তত্ব ও তথ্যালোচনা মনে না করে ইমামের কার্যক্রমের সাথে নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করবেন। এভাবেই তাহলেই এ আলোচনা থেকে উপকৃত হওয়া সহজতর হবে।

আবুদল মান্নান তালিব
১৮০ শান্তিবাগ, ঢাকা

সূচী

পটভূমি ঃ
তাতারী আক্রমণে বিধ্বস্ত মুসলিম বিশ্ব

মুসলমানদের তাতারী আতংক

সপ্তম হিজরীর প্রথমার্ধে 'তাতার' শব্দটি ছিল মুসলমানদের কাছে ভীতি ও আতংকের প্রতীক। তাতারীদের হাতে একের পর এক মার খেতে খেতে মুসলমানরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল, তাতারীরা অজেয়। আরবীতে প্রবাদ প্রচলিত ছিল ঃ ইযা কীলা লাকা ইন্নাত্ তাত্রা ইনহাযামু ফালা তুসাদ্দিক্-'যদি বলা হয় তাতারীরা হেরে গেছে, তাহলে সে কথা বিশ্বাস করো না।'

মুসলমানদের ওপর তাতারীদের এই মার আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। কয়েকশো বছর থেকে তারা দীনের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে আসছিল। ভোগ-বিলাসিতা ও পার্থিব লোভ-লালসার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছিল তারা অন্ধের মতো। অনৈক্য, বিভেদ, আত্মকলহ তাদের দীন ও মিল্লাতের সংহতি বিনষ্ট করে ফেলেছিল এবং বিশেষ করে দুনিয়ায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনের যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছিল তার সম্পূর্ণ উলটো পথে তারা চলতে শুরু করেছিল। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এই ধরনের মারাত্মক শাস্তি ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে?

মুসলমানদের ওপর এ শাস্তি শুরু হয় ৬১৬ হিজরী থেকে। প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত একটানা এ শাস্তি চলতে থাকে। তাদেরকে যেন স্টিম রোলারের সাহায্যে পিষে গুঁড়ো করে দেয়া হয়।

৬১৬ হিজরীতে সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারযাম শাহের আমলে চেংগীজ খান সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঐতিহ্যবাহী বোখারা শহর। বোখারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শহরের একটি লোকও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পারেনি। ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। এরপর সমরকন্দ নগরীকে ভস্মীভূত করা হয়। এখানকার সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। তারপর বড়-ছোট সব শহর এই একই পরিণতির শিকার হয়। হামদান, কাযভীন, রায়, যানজান, মার্ভে, নিশাপুর ইত্যাদি শহরগুলো একের পর এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে থাকে।

এ সময় ইসলামী বিশ্বের পূর্ব এলাকায় খাওয়ারযাম শাহ্ ছিলেন একমাত্র শক্তিশালী শাসনকর্তা। তিনি প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পর অন্যান্য ছোট-খাটো শাসনকর্তারা সামান্যক্ষণের জন্যও ময়দানে তিষ্ঠাতে পারলেন না। তবুও আলাউদ্দীন খাওয়ারযাম শাহের পর তাঁর পুত্র জালাল উদ্দীন খাওয়ারযাম শাহ্ তাতারদের বিরুদ্ধে লড়ে চললেন। কিন্তু তাঁর অবস্থাও শেষ পর্যন্ত চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছুল। লড়াইয়ে

একের পর এক পরাজয় বরণ করতে করতে সেনাদল ও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে ছেড়ে চলে গেলো। তাতারীরা তাঁর পেছনে লেগে থাকল ছায়ার মতো। শেষে তাতারীদের ভয়ে মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সাথে একটি অজ্ঞাত দ্বীপে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

তাতারী আতঙ্ক মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কোনো তাতারীকে দেখলে মুসলমান মনে করতো যেন তার আজরাইল এসে গেছে। অনেক সময় একজন তাতারী একটি গলির মধ্যে ঢুকে একাই একশোজন মুসলমানকে হত্যা করেছে। তাদের কারোর হিম্মত হতো না তাতারীটির বিরুদ্ধে টুঁশব্দ করার। এমন কি একবার একটি তাতারী মহিলা পুরুষের বেশে একটি গৃহে প্রবেশ করে একের পর এক সবাইকে হত্যা করে যেতে থাকে। দেখে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে সবাই যেন শধুমাত্র গলাটি বাড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে আসছিল। হঠাৎ একজনের হুঁশ হলো, আরে এতো একটি তাতারী মেয়ে! সে তরবারির এক আঘাতে মেয়েটিকে সাবাড় করে দিল।

আর এক শহরের ঘটনা। একজন তাতারী একটি গৃহে প্রবেশ করে একজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে। তার কাছে তরবারি ছিল না। তাই সে গৃহের মধ্যে রাখা একটি পাথর নিয়ে আসে। মুসলমানটির কল্লা সেই পাথরের গায় ঠেকিয়ে রাখে। সে হুকুম করে, আমি এখনই বাজার থেকে তরবারি এনে তোকে হত্যা করবো। তুই ঠিক এমনিভাবে থাকবি। খবরদার একটুও নড়বি না। এই বলে তাতারী বাজারে চলে যায়। কিন্তু তাতারীর আতংকে আধমরা মুসলমানটি পালাবার কথা চিন্তাই করেনি। ঠিক একইভাবে হাড়কাঠে মাথা দিয়ে রাখে। ফলে বেশ কিছুক্ষণ পর তাতারীটি বাজার থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এনে নিশ্চিন্তে মুসলমানটির গলা কাটে।

মুসলমানদের মধ্যে এই অবিশ্বাস্য তাতারীভীতি সেকালের একটি জ্বলন্ত সত্য ছিল। আজকের যুগের মুসলমানরা একথা শুনে অবশ্যই অবাক হবে। আজকেরই বা কেন, সে যুগেই তাতারী আতংক কমে যাবার পর মুসলমানরা অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করেছে, তাদের কি হয়ে গিয়েছিল? তারা জীবন্মৃত হয়ে গিয়েছিল কেন? আসলে আল্লাহর ভয় যখন মুসলমানদের মন থেকে তিরোহিত হয় তখন তারা দুনিয়ার সব কিছুকে ভয় করতে থাকে। আর আল্লাহর ভয়ে যখন তারা ভীত থাকে তখন আফগানিস্তানের মতো একটা ছোট অনুন্নত দেশের সাধারণ মুজাহিদ হলেও তারা রাশিয়ার মতো আধুনিক বিশ্বের একটি পরাশক্তিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে শেখে।

ধ্বংসের প্রতীক তাতারী

তাতারীরা মুসলমানদের শুধু প্রাণনাশ ও ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত থাকেনি, তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীগুলোও ধ্বংস করে। তারা ছিল মধ্য এশিয়ার বর্বর উপজাতি। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পাশবিক উন্মাদনায় তারা মেতে উঠেছিল।

সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা এ ধরনের অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন আর কোনোদিন হয়নি। তাতারীদের এই জুলুম-অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সে যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকদের কলম কেঁপে উঠেছে। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর লিখেছেন ঃ

"দুনিয়ার ইতিহাসে এ ধরনের মহাদুর্ঘটনার কোনো নজীর নেই। এ ঘটনার সম্পর্ক সব মানুষের সাথে তবে মুসলমানদের সাথে এর সম্পর্ক বিশেষভাবে। কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে, আদম আলাইহিস সালামের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এই ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি, তাহলে সে মোটেই মিথ্যা দাবী করবে না। ...... এই বর্বরতা কারোর প্রতি একটুও করুণা করেনি। তারা নারী, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ সবাইকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মেয়েদের পেটে তরবারি মেরে পেট চিরে ফেলেছে এবং পেট থেকে বের হয়ে আসা অপরিপুষ্ট বাচ্চাটিকেও কেটে টুকরো টুকরো করেছে।"

তাতারী ফিতনা সে সময় শুধু মুসলমানদের জন্য নয় সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এশিয়ায় মুসলমানদের ওপর তাতারীদের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী শুনে ইউরোপের অধিবাসীরাও আতংকে কেঁপে উঠেছিল। তাতারীদের বর্বর অভিযান চেংগীজ খান থেকে শুরু হয় এবং তার প্রপুত্র কুবলাই খান পর্যন্ত ৪০ বছর ধরে চলতে থাকে তুফানের বেগে।

লাশের নগরী বাগদাদ

ঘরের শত্রু বিভীষণরাই চিরকাল ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ করে এসেছে। অবশ্য সব দেশেই এরা জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এরা যে ধ্বংস ডেকে আনে তার তুলনা নেই। কারণ মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারে এমন শক্তি দুনিয়ায় নেই। একমাত্র আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিরোধের কারণে যখন তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় তখনই বাইরের কোনো শত্রু মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। আর এই ঘরের শত্রু বিভীষণরা মুসলমানদের সেই আভ্যন্তরীণ বিরোধের আগুন উশ্‌কিয়ে দেয়।

এই বিভীষণরা হয় তিন জাতের। একদল হয় ইসলামের শত্রু। একদল মুসলমানদের শত্রু। আর একদল দেশের শত্রু। তবে তিন জাতের হলেও তাদের মধ্যে একটা অভাবনীয় সখ্যতা রয়েছে। যারা ইসলামের শত্রু তারা যে মুসলমানদের ও দেশের প্রেমে গদগদ এমনটি বলা যাবে না। ইসলাম তাদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল। ইসলামের ওপর তারা এলোপাথাড়ি এবং সর্বশক্তি নিয়ে আক্রমণ চালায়। তবে অন্য দু'টোর ওপরও কখনো-কখনো চলে ছিটেফোটা আক্রমণ। মুসলমান ও দেশের শত্রুদের সম্পর্কেও এই একই কথা। ইসলামের দার্শনিক রূপকার কবি আল্লামা ইকবালও তাঁর এক কবিতায় ঘরের শত্রু

বিভীষণদের এ তিনটি জাতের প্রতি ইংগিত করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ 'জাফর আয বাঙ্গাল সাদেক আয দক্ষিণ/নাঙ্গে দ্বীঁ, নাঙ্গে মিল্লাত, নাঙ্গে ওয়াতন'—বাংলার বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আর দাক্ষিণাত্যের মীর সাদেক, এরা হচ্ছে দীন ইসলাম, মিল্লাতে ইসলামিয়া ও স্বদেশের কলংক। অর্থাৎ এ ঘরের শত্রু বিভীষণরা তিন জাতেরই হয়ে থাকে। এরা ইসলামের শত্রু, মুসলিম মিল্লাতের শত্রু এবং মুসলমানদের স্বদেশ ভূমিরও শত্রু। মুসলমানদের দেশে ও মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বাস করে কোনো এক ব্যক্তি ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করার পরও মুসলিম মিল্লাত ও মুসলমানদের স্বদেশভূমির প্রেমে পাগলপারা হতে পারে কেমন করে, একথা মোটেই বোধগম্য নয়। আসলে ইসলামকে বাদ দিলে মুসলিম মিল্লাত ও মুসলমানদের স্বদেশভূমির পৃথক কোনো অস্তিত্ব ও গুরুত্ব থাকে না।

ইসলামের ইতিহাসে এই ঘরের শত্রু বিভীষণদের অস্তিত্ব কোনোদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। নিত্য নতুন রূপে এদের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনো ঘটছে। সেদিন বাগদাদে এরাই ঘটিয়েছিল চরম ধ্বংস যজ্ঞ। ঘটনাটা ছিল ৬৫৬ হিজরী সালের।

ইসলাম, মুসলিম মিল্লাত ও তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি বাগদাদের বিশ্বাসঘাতকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বাগদাদের শিয়া প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামী ও তাতারী শাসকদের মুসলিম পরামর্শদাতা নাসিরুদ্দীন তুসী। এই বিশ্বাসঘাতকরা বাগদাদকে ধ্বংস করার জন্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করে। এ বিশ্বাস ঘাতকরা মনে করেছিল বর্বর তাতারীরা বাগদাদ আক্রমণ করে হত্যা ও লুণ্ঠন করে চলে যাবে তারপর তারাই হবে বাগদাদের একচ্ছত্র মালিক। এছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তাদের জন্য ছিল চক্ষুশূল। মুসলমানের ছদ্মাবরণে তারা ছিল আসলে মুনাফিক। তাই ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম জনপদের লাঞ্ছনা তাদের কলজে ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

বর্বর তাতারী সেনারা তখন ছিল অপ্রতিরোধ্য। একের পর এক মুসলিম জনপদ ও নগরগুলো ধ্বংস করে তারা সারা ইসলামী জাহানে ত্রাস সৃষ্টি করে ফিরছিল। এ সময় ইবনে আলকামী ও নাসিরুদ্দীন তুসীর প্ররোচনায় তাতারীরা বাগদাদের দিকে এগিয়ে এলো। চেংগীজের নাতি হালাকু খান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে বাগদাদের উপকণ্ঠে হাজির হলো।

ওদিকে প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামী বাদশাহ মুসতা'সাম বিল্লাহকে পরামর্শ দিল হালাকুর সাথে সন্ধি করার। বিপুল পরিমাণ সোনা ও উপঢৌকন পেলে হালাকু চলে যাবে বলে আশ্বাস দিল। আলকামীর পরামর্শে বাদশাহ হালাকুর শিবিরে গিয়ে তার সাথে সন্ধির শর্তগুলো চূড়ান্ত করে নিতে প্রস্তুত হলেন। বাদশাহর শিবিকা হালাকুর ছাউনিতে পৌঁছে গেলো। তারপর সন্ধিপত্রে সাক্ষী হিসেবে সই করার জন্য বাদশাহর উপর চাপ প্রয়োগ করে নগরের সব

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাতারীদের ছাউনীতে আনার ব্যবস্থা হলো। তারা আসার সাথে সাথে তাদের সবাইকে বাদশাহর সামনে হত্যা করা হলো। এভাবে বাদশাহর পত্র আদায় করে একের পর এক শহরের ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাশালী লোকদের তাতারী শিবিরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। কিন্তু তাতারীরা বাদশাহকে হত্যা করতে ভয় পাচ্ছিল। কারণ তারা ছিল কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা শুনেছিল বাদশাহর রক্ত জমিনে পড়ার সাথে সাথেই কোনো বিরাট আকারের ধ্বংস দেখা দেবে। তাই তারা ইতস্তত করছিল। তখন নাসিরুদ্দীন তাদের এমন একটা পরামর্শ দিল যার ফলে বাদশাহ মারা যাবে কিন্তু তার এক ফোঁটা রক্ত জমিনে পড়বে না। নাসিরুদ্দীনের পরামর্শে তারা বাদশাহকে বিরাট তোষকের মধ্যে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললো। তারপর লাথি ও আছাড় মারতে মারতে তাঁকে শেষ করে দিল।

বাগদাদের ভাগ্যে তারপর যা লেখা ছিল তাই হলো। ৪০ দিন পর্যন্ত চললো হত্যা ও লুটতরাজ। চল্লিশ দিন পর সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী, স্বপনপুরী, জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র বাগদাদ প্রেতপুরী বলে মনে হলো। শহর সুনসান হয়ে গেলো। পথে ঘাটে, হাটে-বাজারে কোথাও মাত্র দু'চারটে মানুষ দেখা যেতো।

পথে হাঁটলে কিছু দূরে দূরে দেখা যেতো লাশের স্তূপ। মনে হতো যেন ছোট-খাটো লাশের পাহাড়। এ সময় বৃষ্টি হলো। লাশ ফুলে গেলো। পচন ধরলো। সমস্ত শহরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। যারা বেঁচে ছিল তারা মহামারীতে আক্রান্ত হলো। এ দুর্গন্ধ বাগদাদ ছাড়িয়ে সিরিয়া সীমান্তেও প্রবেশ করলো। ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় বাগদাদে প্রায় ১৮ লাখ লোক নিহত হয়।

হালাকু বাগদাদে প্রবেশ করে খৃস্টানদের প্রকাশ্যে শরাব পান ও শুয়োরের গোশ্ত খাবার নির্দেশ দিল। রমযান মাস ছিল। কিন্তু মুসলমানদের জোর করে শরাব পানে বাধ্য করা হলো। মসজিদের মধ্যে মদ ঢেলে দেয়া হলো। আযান নিষিদ্ধ করা হলো।

বাগদাদ ছিল তদানীন্তন ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। শহরের জনবসতি শুরু হবার পর থেকে এই প্রথমবার কাফেরদের করতলগত হলো বাগদাদ। সমগ্র ইসলামী বিশ্বে চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়লো। বাগদাদের ধ্বংস কাহিনী যেখানে পৌঁছুলো সেখানকার মুসলমানরা মাতম করতে লাগলো। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছিল না। বিশ্বাসঘাতক শুধু বাগদাদেই নয়, সারা ইসলামী বিশ্বের সব দেশেই সক্রিয় ছিল। এই বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল না করা পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সংকট মুক্তির কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

তাতারী অজেয় নয়

বাগদাদের পর তাতারীরা সিরিয়া অধিকার করলো। সিরিয়ার পথঘাট মুসলমানদের রক্তে ভেসে গেলো। নগরে গ্রামে লাশের স্তূপ জমে উঠলো। সর্বত্র একই অবস্থা। তাশখন্দ থেকে বোখারা, বোখারা থেকে বাগদাদ আর বাগদাদ

থেকে দামেশক। কোথাও মুসলমানদের মাথা গুজবার ঠাঁই নেই। এরপর মিসরের পালা। মিসরবাসীরা ভালোভাবে বুঝতে পারলো তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। আল্লাহর গযব তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু মিসরবাসীরা শেষ পর্যন্ত চমক সৃষ্টি করলো। তারা এগিয়ে এসে তাতারীদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলো। ৬৫৮ হিজরীতে মিসরের সুলতান আলমালিকুল মুযাফফর সাইফুদ্দীন কুতার আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। মিসরের সীমানা পেরিয়ে তারা সিরিয়ার জালুত নামক স্থানে তাতারীদের বাধা দিলেন। তাতারীদের এতদিনকার সমস্ত রেকর্ড ভংগ হলো। তারা পরাজয় বরণ করলো। প্রথম পরাজয়। শোচনীয় পরাজয়। অন্যদিকে মুসলমানদের বুকের বল হাজার গুণ বেড়ে গেলো। তাতারীরা অজেয়, এ বিশ্বাস ও ভয় তাদের মন থেকে মুছে গেলো। তারা দুরন্ত সাহসী হয়ে উঠলো। তাতারীদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল সিরিয়ার দূরদূরান্ত পর্যন্ত। তাতারীদের লাশ পথে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো। তারা মরতে লাগলো মুসলমানদের হাতে শিয়াল কুকুরের মতো। বিপুল সংখ্যক তাতারীকে কয়েদীও বানানো হলো।

এরপরও তাতারীরা অবশ্য মিসরীয়দের হাতে আরো কয়েকবার পরাজিত হয়েছে। কিন্তু চতুরদিকে যেভাবে তাতারীদের বিজয় অভিযান তুফানের বেগে এগিয়ে চলছিল তাতে মিসরীয়দের দৃঢ়তা কতটুকুইবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া তখন তাতারীরা ছিল আক্রমণকারী আর মুসলমানরা করছিল প্রতিরক্ষার যুদ্ধ। এ অবস্থায় আক্রমণকারী অবশ্য ভালো পজিশনে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সমগ্র ইসলামী বিশ্ব তাতারীদের তুফানী আক্রমণে ও বর্বর নির্যাতনে ধ্বংসের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল মুসলমানদের আয়ু বুঝি আর বেশি দিন নেই। আল্লাহ বুঝি এ জাতিকে তার পাপের শাস্তি এ দুনিয়ায়ই দেবার সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন।

কিন্তু না, আল্লাহর সত্যদীনের যথার্থ অনুসারীরা তখনো দুনিয়ায় ছিলেন বিপুল সংখ্যায়। সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা তখন আল্লাহর দীনের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই জাতিগতভাবে তাদের ওপর নেমে এসেছিল আল্লাহর রোষাগ্নি। কিন্তু জাতিগতভাবে তারা আল্লাহর দীনকে পরিত্যাগ করেনি এবং তাদের একটি অংশ তখনো দীনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল। আর তাতারী আক্রমণের বিভীষিকা মুসলমানদের নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করার এবং খাঁটি মুসলিম ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। তাই আল্লাহ মুসলিম মিল্লাতকে দুনিয়ার বুকে আর একবার টিকে থাকার সুযোগ দিলেন।

নয়তো এ পর্যন্ত কোনো জাতি এ ধরনের ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে দ্বিতীয়বার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। যে জাতি একবার এক নতুন সভ্যতার জন্ম

দিয়েছিল, পৃথিবীর বুকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চিহ্নিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, কালের আবর্তনে একদিন তার নাম নিশানা মুছে গেছে। আবার দ্বিতীয়বার তার সেই একই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করার সুযোগ হয়নি। গ্রীক, রোমান ও মিসরীয় জাতিদের সভ্যতা আমাদের সামনে রয়েছে। এই উপমাহাদেশে আর্য সভ্যতার বিস্তার ও ব্যাপকতাও ছিল ঐতিহাসিক। কিন্তু একবার ধ্বংসের পর তারা শুধুমাত্র অতীতের পাতায়ই আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ধর্ম, নৈতিকতা, রীতিনীতি সবই আজ বাসি। বনি ইসরাঈলরা হাজার হাজার বছর পরে আবার আজকে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে একটা নতুন রাষ্ট্র নিয়ে জেঁকে বসলেও তাদের আজকের সমাজ সভ্যতায় মূসা আলাইহিস সালামের দীনের ছিটেফোঁটাও নেই। পাশ্চাত্য সমাজ-সভ্যতার অন্ধ অনুসারী হিসেবে তারা আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক অংকের অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে মাত্র। আধুনিক ভারত সম্পর্কেও একই কথা।

কিন্তু ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত সমাজ-সভ্যতার যে উপাদান এ জীবন বিধান সরবরাহ করে যাবে, মুসলমানরা দুনিয়ার যে এলাকায় যখনই তাকে আঁকড়ে ধরবে তখনই সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা তাদের পায়ের তলায় এসে লুটোপুটি খাবে। তারা দুনিয়ায় মর্যাদার সাথে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে। আজকের দুনিয়ার মুসলমানরাই এর প্রমাণ। ইসলামকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও মূল্যবোধকে আত্মস্থ করতে গিয়েই মুসলমানরা দুনিয়ার সর্বত্রই আজ লাঞ্ছিত। অথচ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলো তাদের অধিকারে রয়েছে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে।

যাক, মুসলমানদের আধুনিক সংকটের কথা বাদ দিয়ে আমরা আবার সপ্তম হিজরীতে ফিরে আসছি। সেদিন ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনই মুসলমানদের বাঁচিয়েছিল। এটা ইসলামের অফুরন্ত প্রাণশক্তির একটা প্রমাণ। কোনো নির্জীব ও মৃতপ্রায় জাতি এটা গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার বুকে জাগে প্রাণের জোয়ার। দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার অভিযান চলতে থাকে।

ইসলামের ছায়াতলে তাতারীরা

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তাতারীদের হাতে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হবার পর মুসলমানরা আবার কেমন করে চাঙ্গা হয়ে উঠলো, সে এক চমকপ্রদ ইতিহাস। যারা মুসলমানদেরকে সবংশে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা নিজেরাই মুসলমানদের সারিতে এসে দাঁড়ালো। ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য যারা কসম খেয়ে বসেছিল তারা নত

মস্তকে ইসলামের বাণী শিরোধার্য করে নিল। বিনা শর্তে তারা ইসলামকে নিজেদের একমাত্র জীবন বিধান বলে মেনে নিল। মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য ও বর্বর তাতারীরা অবশেষে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে মাথা নত করলো। তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। তাতারীদের হাতে সপ্তম হিজরীর ইসলামী বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞ যতটা বিস্ময়কর ছিল না তার চাইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর ছিল তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। কারণ মুসলিম সমাজ ও ইসলামী বিশ্বের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সেকালে তাতারীদের মতো একটি তাজাদম ও কষ্টসহিষ্ণু জাতির বিজয়কে নিশ্চিত করে দেবে এতে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। কিন্তু ইসলামকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করতে এসে ইসলামের নিকট বিজিত হওয়া সত্যিই ইতিহাসের সবচাইতে বিস্ময়কর ঘটনা। ঐতিহাসিক টি, ডবলিউ আরনল্ড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Preaching of Islam-এ এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু ইসলাম তার অতীতের শান-শওকতের ভস্মস্তূপ থেকে আবার জেগে উঠলো। যে বর্বর মোগলরা মুসলমানদের ওপর সব রকমের নির্যাতন চালিয়েও ছিল মুসলিম ধর্ম প্রচারক ও বক্তাগণ তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে নিলেন। এ কাজটা মুসলমানদের জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। কেননা অন্য দুটি ধর্মের প্রচারকরা তাতারীদেরকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ......ইসলামের পক্ষে এ সময় খৃস্ট ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মোকাবিলা করে মোগলদের এ দুটি ধর্ম থেকে সরিয়ে এনে ইসলামের অনুসারী করা একরকম অসম্ভব কাজ বলে মনে হচ্ছিল। কারণ মোগলদের হাতে মুসলমানরাই হয়েছিল সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত। যেসব বড় বড় শহর ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং যেখানে গড়ে উঠেছিল মুসলিম জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোকদের আবাস, সেগুলো তাতারী মোগলদের অস্ত্রাঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। মুসলমান আলেম ও ফকীহগণ নিহত অথবা গোলামে পরিণত হয়েছিল। মোগল খানরা ইসলাম ছাড়া সব ধর্মের প্রতি ছিল উদার। ইসলামের প্রতি তারা পোষণ করতো অসীম ঘৃণা ও শত্রুতা। ....

ইসলামের প্রতি মোগলদের এ ধরনের হিংস্র মনোভাব পোষণ করার পরও তারা যে জাতিকে নিজেদের পায়ের তলায় দাবিয়েছিল অবশেষে তাদেরই ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল।"[১]

---

১. এটা সম্ভব হয়েছিল একদল আলেম, বুযর্গ ও সৎ মুসলিম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে। তবে এ ব্যাপারে সবচাইতে বড় ইতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন উচ্চশিক্ষিতা মুসলিম মহিলাবৃন্দ, তাতারীরা যাদেরকে লুণ্ঠন করে নিজেদের হেরেমে স্থান দিয়েছিল। এই সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না ঈমানদার মহিলাগণ অন্তঃপুরে বসে বসে তাদের স্বামীদের অন্তরজগতকে ইসলাম ও ঈমানের জন্য উর্বর করে তুলেছিলেন।

তাতারীদের অপরিবর্তিত চেহারা ঃ ইবনে তাইমিয়ার প্রচেষ্টা

তাতারীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের গোপন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছিল। তাই তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের ধারা কখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে তার গতি কখনো দ্রুত হচ্ছিল আবার কখনো হয়ে পড়ছিল মন্থর। মুসলমানদের ওপর তাতারীদের প্রথম আক্রমণ হয় ৬১৬ হিজরী সনে। সে আক্রমণ পরিচালনা করেন তাতারী সরদার চেংগীজ খান নিজেই। আর প্রথম তাতারী সম্রাট ইসলাম গ্রহণ করেন ৬৫৬ হিজরী সনে। মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে তাতারীরা শত্রুদের ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাতারীদের আপাদমস্তক পরিবর্তন হয়ে যায়নি। তারা মুসলমানদের সাথে সব শত্রুতা ভুলে তাদেরকে বন্ধু ও ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরেনি। অবশ্য কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী তাতারী সম্রাট বারকা খান ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের ওপর আর আক্রমণ করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সব তাতারী সম্রাট এমন ছিলেন না। ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগেই তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়নি। যেমন ইরান ও ইরাকের বাদশাহ কাজান ৬৯৪ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ও অভিযান চলতে থাকে। ৬৯৯ হিজরীতে তিনি সিরিয়া আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। আসলে তাদের জীবন-যাপন প্রণালী যে অবস্থায় ছিল তাতে ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র চার পাঁচ বছরের মধ্যেই তাদের জীবনে ও চরিত্রে কোন বড় রকমের পরিবর্তন আশা করা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তাই কাজানের পক্ষে সিরিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

তাতারী সম্রাট কাজানের মুখোমুখি ইবনে তাইমিয়া

তাতারীদের আক্রমণের খবর যখন সিরিয়ায় পৌঁছলো, সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার হলো। তাতারী আক্রমণের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে মুসলমানরা অবহিত ছিল। তাই আশেপাশের বিভিন্ন শহর থেকে লোকেরা রাজধানী দামেশকের দিকে চলে আসতে লাগলো।

দামেশকের মুসলমানদের মধ্যেও কম ভীতির সঞ্চার হয়নি। কিন্তু সেখানে তখন আল্লাহর এমন একজন মর্দে মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন যার ঈমানী শক্তি মুসলমানদের মুর্দা দিলে সাহস যোগাচ্ছিল। তিনি হলেন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি।

খবর এলো মিসরের বাদশাহ তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে দমেশকের মুসলমানদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন। নগরীতে যেন প্রাণের সাড়া জাগলো। মুসলমানরা নতুন উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবিউল আউয়াল কাজানের সাথে মিসরের সুলতানের সংঘর্ষ হলো। অনেক চেষ্টা করেও এবং অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেও মুসলমানরা শেষ রক্ষা করতে পারল না। মুসলমানরা হেরে গেলো। মিসরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হলেন।

দামেশকবাসীরা পড়লো মহাসংকটে। তাতারী সেনাদল এবার বিজয়ীর বেশে নগরে প্রবেশ করবে। তারপর নগরবাসীদের ভবিষ্যত যে কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তাতারী বিভীষিকার কথা চিন্তা করে বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও শহর ত্যাগ করতে শুরু করলো। শাফেয়ী ও মালেকী কাযী এবং অন্যান্য পরিচিত আলেম ওলামা, সরকারী অফিসার, বড় বড় ব্যবসায়ী এমনকি শহরের গভর্ণর নিজেও শহর ত্যাগ করে মিসরের পথে পাড়ি জমালেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেবলমাত্র দুর্গরক্ষক শহর ত্যাগ করেননি। জনগণের এক অংশও শহর ত্যাগ করেছিল। এদিকে জিনিসপত্রের দামও অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। বিপদের ওপর আরো একটি বাড়তি বিপদ দামেশকবাসীদের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছিল। কয়েদিরা জেলখানা ভেঙ্গে বের হয়ে এসেছিল। সারা শহরে দিনরাত তারা সমানে লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে কাজানের সেনাদলের দামেশক প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। জনতা উভয় সংকটে পড়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নেতৃত্বে নগরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল কাজানের দরবারে উপস্থিত হয়ে নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ফরমান লিখে আনবেন। রবিউস সানি মাসের তিন তারিখে মহাপরাক্রমশালী তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে হাজির হলেন ইসলামের দূত ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর দলবল নিয়ে। ইমাম আদল, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি সম্পর্কিত কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন কাজানের সামনে। তাঁর আওয়াজ ধীরে ধীরে বুলন্দ ও গুরুগম্ভীর হচ্ছিল। আয়াত ও হাদীস শুনাতে শুনাতে তিনি কাজানের নিকটে, আরো নিকটে চলে যাচ্ছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর ও

কাজানের মাঝখানে এক বিঘতও ফাঁক ছিল না। কিন্তু সবচাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালী কাজান এতে মোটেই বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন না। বরং তিনি নিবিষ্ট মনে কান লাগিয়ে সব কথা শুনছিলেন। মনে হচ্ছিল ইমাম তাকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ আলেমটি কে? আমি এমন লোক ইতিপূর্বে দেখিনি। এর চাইতে কোন সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আমাকে কেউ তো এমন করে প্রভাবিত করতে পারেনি।

লোকেরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে তাঁকে জানালো এবং ইমামের ইলম, জ্ঞান ও কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কাজানকে বললেন ঃ তুমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করো। আমি জানতে পেরেছি তোমার সাথে কাজী, শায়খ ও মুয়াজ্জিনরাও আছেন। কিন্তু এসব সত্বেও তুমি মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছো। অথচ তোমার বাপ-দাদা কাফের হওয়া সত্বেও এ ধরনের কাজ করতে ইতস্তত করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা পালন করেছেন। আর তুমি ওয়াদা ভেঙেছো। তুমি যা কিছু বলেছিলে তা পালন করনি। তুমি আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম করেছো।

প্রধান বিচারপতি আবুল আব্বাস ইমামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ কাজানের মজলিসে ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর সাথিদের সামনে খাবার রাখা হলো। সবাই খেতে লাগলেন কিন্তু ইবনে তাইমিয়া হাত গুটিয়ে নিলেন। খাচ্ছেন না কেন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ এ খাবার তো হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলমানদের থেকে লুঠ করা ভেড়া ও ছাগলের গোশত থেকে এ খাদ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর মজলুম মানুষের গাছ থেকে জবরদস্তি কাঠ সংগ্রহ করে এ খাদ্য তৈরি করা হয়েছে। কাজান তাঁকে দোয়া করার আবেদন জানালেন। তিনি দোয়া করতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি ভালো জানো, যদি কাজানের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য তোমার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করাই হয়ে থাকে তাহলে তুমি তাকে সাহায্য করো। আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ লালসা চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তুমিই তার সাথে বোঝাপড়া করো। সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইমাম দোয়া করছিলেন আর কাজান 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন।

কাজী আবুল আব্বাস আরো লিখেছেন যে, ইমাম যখন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের জামাকাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম–কি জানি কখন ইমামের ওপর জল্লাদের তরবারী ঝলসে উঠবে এবং তাঁর রক্তে আমাদের বস্ত্র রঞ্জিত হবে। কাজী সাহেব লিখেছেন ঃ কাজানের

দরবার থেকে ফিরে আসার সময় আমরা ইমামকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যাবো না। আপনি তো আমাদের সবাইকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন।' ইমাম জবাবে বললেন, 'আমি তোমাদের সাথে যাবো না।' কাজেই আমরা সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে এলাম। ইমাম একাই রওয়ানা দিলেন। ইমামের একাকীত্বের খবর শুনে মেয়েরা ঘর থেকে বের হয়ে এলো। বহু নেতৃস্থানীয় লোক তাঁকে সঙ্গ দিল। তিনি তিন চারশো ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে রাজার হালে শহরে ফিরে এলেন। আর আমরা রাস্তায় একদল লুটেরার হাতে সর্বস্ব খুইয়ে ঘরে ফিরলাম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া কাজানের দরবার থেকে ফিরে আসেন অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে। নগরবাসীদের জন্য লিখিয়ে আনেন নিরাপত্তার পরোয়ানা। তাতারীরা যেসব মুসলমানকে বন্দী করেছিল তাদের ছাড়িয়ে আনেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী তিনি অনেক শুনেছিলেন। নিজের চোখে দেখেছিলেনও অনেক। কিন্তু সেসব তাঁকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। তাতারী সম্রাটের সাথে মুখোমুখি কথা বলতে এবং তাতারী সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেননি। তিনি বলতেন, যার দিলে কোন রোগ আছে একমাত্র সেই গাইরুল্লাহকে ভয় করতে পারে।

তাতারীদের অংগীকার ভংগ ও নির্যাতন

ইমাম নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখিয়ে আনলেও নগরবাসীদের মনে স্বস্তি ছিল না। তারা যে ভয় করছিল বাস্তবে হলোও তাই। কিছুদিনের মধ্যে নগরবাসীদের মনের শান্তি উবে গেল। তাতারীরা নগরে প্রবেশ করেনি ঠিকই, কিন্তু নগরের বাইরে তারা ছাউনি করে পড়ে রইলো। শহর প্রাচীরের বাইরে শহরতলীতে তাদের অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যা চলতে লাগলো। তাতারী সেনাদের বহুদিনের গড়ে তোলা অভ্যাস হত্যা ও লুটতরাজ ছাড়া যেন তাদের বিজয় সম্পন্ন হতে পারে না। শহরের বাইরের সমগ্র এলাকাকে দস্তুরমতো একটা যুদ্ধক্ষেত্রেই মনে হতো। সশস্ত্র তাতারী সেনারা দল বেঁধে জনপদে ঢুকে পড়েছে। মুসলমানদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে লুকানো সম্পদ বের করে দেবার জন্য গৃহকর্তার হাতে-পায়ে বেঁধে বেদম প্রহার চালাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে আছাড় মারছে। মেয়েদের কানফাটা চীৎকার কাকুতি-মিনতি সব মিলে দামেশকের মুসলমানদের শান্তি মনে হচ্ছিল চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

তাতারীদের ঘেরাও ও জুলুম নির্যাতনের কারণে আশেপাশের এলাকা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বাজারে জিনিস-পত্রের দামে যেন আগুণ লেগেছিল। তার ওপর কড়ি ফেললেও জিনিস পাওয়া যেতো না। ফলে খাদ্যের অভাবে অনাহারেও লোক মরতে লাগলো।

এর ওপর তাতারীরা আবার নগরবাসীদের কাছে এক অভিনব দাবী করে বসলো। নগরে যত ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র আছে তাদের কাছে এনে জমা দিতে হবে। নগদ টাকা পয়সাও যা কিছু নগরবাসীদের কাছে লুকানো আছে তা সব গোপন কুঠরী থেকে বের করে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

সাইফুদ্দীন কুবজুক নামে একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত নও-মুসলিম তাতারীকে তারা নগরের নতুন শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নগরে পাঠিয়ে দিল। কুবজুক নগরবাসীদের ওপর একের পর এক চাপ সৃষ্টি করে চললো। এদিকে নগরের ওপর তাতারীদের আধিপত্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেবলমাত্র আরজাওয়াশ দুর্গটি তখনো স্বাধীনভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্গাধিপতি কোনক্রমেই বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। ঐতিহাসিক ইবনে আসির লিখেছেনঃ 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নির্দেশই দুর্গাধিপতির মনে সাহস সঞ্চার করেছিল। ইমাম তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যতক্ষণ কেল্লার একটি ইটও অক্ষত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র সংবরণ করবেন না। কেল্লার দরজা কোনক্রমেই তাতারীদের জন্য খুলে দেবেন না।' দুর্গাধিপতি শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এ নির্দেশ মেনে চলেন। ফলে তাতারীরা এ দুর্গটি আর দখল করতে পারেনি।

তাতারী সেনাদের জুলুম নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। তারা হাজার হাজার মুসলমান নারী পুরুষকে বন্দী করে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদীতে পরিণত করে। একমাত্র সালেহীয়া পল্লীতে তারা চারশো মুসলমানকে হত্যা করে, প্রায় চার হাজারকে গ্রেফতার করে গোলাম ও বাঁদীতে পরিণত করে। এর মধ্যে অনেক অভিজাত বংশের লোকও ছিল। অনেক বড় বড় পাঠাগার লুণ্ঠন করে লক্ষ লক্ষ টাকার বই-পত্র নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা হয়।

এ অবস্থা দেখে ইবনে তাইমিয়া আর একবার কাজানের সাথে দেখা করতে মনস্থ করলেন। তিনি দলবল নিয়ে রবিউস সানী মাসের ২৫ তারিখে সুলতান কাজানের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। কিন্তু দুদিন ধরে অপেক্ষা করার পরও তাকে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করতে দেয়া হলো না। ইত্যবসরে দামেশকে খবর ছড়িয়ে পড়লো তাতারীরা এবার শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। এত দিন তাতারী সৈন্যরা শহর প্রাচীরের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে ছিল। এবার তারা শহরের মধ্যে প্রবেশ করবে, এ খবর শুনে শহরবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। এতদিন বাঘ শিকারের সামনে বসে তামাসা দেখছিল। এবার যেন শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। শহরে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। লোকেরা নগর ছেড়ে বাইরে চলে যেতে চাইলো। কিন্তু যাবে কোথায়? চারদিকেই তাতারীদের অবরোধ। তাতারীরা কেল্লা জয় করার ব্যবস্থা করতে লাগলো। তারা কেল্লার চারদিকে পরিখা খনন করলো। মিনজানিক বসালো

কিল্লার প্রচীরে পাথর নিক্ষেপ করে ফাটল ধরাবার জন্য। লোকেরা ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করলো। কারণ তাতারীরা পথেঘাটে কাউকে দেখলেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটাতো। তাদেরকে দিয়ে পরিখা খনন করাতো। ইবনে কাসীর তাঁর আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'পথঘাট একেবারে সূনসান হয়ে গেলো। কখনো কখনো পথে ঘাটে এক দু'জনকে দেখা যেতো। জামে মসজিদে নামাজীদের সংখ্যা একেবারেই কমে গেলো। জুমার নামাযে জামে উমূবীতে (কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ) বড়জোর একটি কাতার পূর্ণ হতো। আর হয়তো দু'চারজন লোক পিছনে থাকতো। যে ব্যাক্তি নেহায়েত প্রয়োজনে বাইরে বের হতো সেও তাতারীদের পোশাক পরে নিতো। নিজের কাজ চটপট সেরে নিয়ে সে সোজা ঘরে ফিরতো। তবুও মনের মধ্যে সবসময় খটকা লেগে থাকতো, কি জানি হয়তো আর ঘরে ফেরা যাবে না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতারীরা আর কেল্লা আক্রমণ করলো না। কাজান তার সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা দিলেন। সিরিয়ায় রেখে গেলেন নিজের প্রতিনিধি এবং তার অধীনে ষাট হাজার তাতারী সৈন্য। যাবার পথে বলে গেলেন, আমি নিজের প্রতিনিধি ও সেনাদল রেখে যাচ্ছি, আগামী বছর শীতকালে আবার আসবো। সে সময় আমরা সিরিয়ার সাথে মিসরও জয় করে নেবো।

কাজান চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় তাতারী আমীর বুলাই খান দামেশকের চারপাশে লুটতরাজ শুরু করলো। ফলে কিছুদিনের মধ্যে বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুসিত এলাকাগুলো বিরান হয়ে গেলো। বহু মুসলমান ছেলেমেয়ে গোলাম ও বাঁদীতে পরিণত হলো। দামেশক শহর থেকেও সে বহু টাকা-পয়সা আদায় করলো। অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বুলাই খানের সেনানিবাসে হাজির হলেন। বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করলেন। বিপুল সংখ্যক বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে ফিরে এলেন। মুক্তিলাভকারীদের মধ্যে কেবল মুসলমানই ছিল না, অনেক অমুসলিমও ছিল। একদিন দামেশকের কেল্লাধিপতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, সিরিয়ার সাহায্যের জন্য মিসরীয় সেনাবাহিনী দামেশকের দিকে এগিয়ে আসছে। এর পরের দিন বুলাই খান তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেলো। শহরে আর একটিও তাতারী দেখা গেলো না। এ সময় দামেশকে কোন দায়িত্বশীল গভর্ণর বা শাসক ছিল না। তাতারী হামলায় নগর প্রাচীর স্থানে স্থানে ভেঙে পড়েছিল। আরজাওয়াশ কেল্লার অধিপতি নগরবাসীদেরকে রাতে নিদ্রা না গিয়ে নগর প্রাচীর পাহারা দেবার নির্দেশ দিলেন। লোকদের সাথে সাথে ইবনে তাইমিয়াও রাতের পর রাত ভগ্ন প্রাচীর পাহারা দিয়ে কাটাতে থাকেন।

সাতশো হিজরী পর্যন্ত তাতারীদের বিরাট অংশ মুসলমান হয়ে গেলেও মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধের সিলসিলা খতম হয়ে যায়নি। আর খতম হয়ে যাওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল না। কারণ ইসলামের উন্মেষের সাতশো বছর পর মুসলিম সমাজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল ইসলামের মূলনীতি ও মুসলিম চরিত্রের উন্নততর গুণাবলী সেখানে এমন ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়েছিল, যার ফলে একটি নও-মুসলিম সমাজের পক্ষে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা মোটেই সহজতর ছিল না। ফলে মুসলমানদের থেকে তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। তারা মনে করতো, মুসলমানদের বর্তমান শাসকদের মুসলমানদের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাবার কোনো অধিকার নেই। বরং সমগ্র মুসলিম এলাকার শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাতারীদের প্রাপ্য। এটা তাতারীদের দীনি ও ঈমানী অসম্পূর্ণতা ও অপরিপক্কতার প্রমাণ।

সিরিয়ায় তাদের স্বল্পকালীন শাসনও তাদের এ দীনি অসম্পূর্ণতা ও অপরিপক্কতার প্রকাশ ঘটায়। এ সময় তাতারী নও-মুসলিম সাইফুদ্দীন কুবজুক ছিলেন দামেশকের শাসক। তিনি নগরে মদ ব্যবসায়ের অবাধ লাইসেন্স দেন। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃহত্তম উৎস। নগরে মদের প্রচলন ব্যাপকতা লাভ করে। অসংখ্য নতুন নতুন মদের দোকান খোলা হয়। নগরের অমুসলিম বাসিন্দারা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

বেদীনী ও ফিত্না নির্মূলে ইবনে তাইমিয়া

তাতারীদের নগর ছেড়ে চলে যাবার পর গোনাহের এ উৎসগুলো অক্ষত রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা মুসলমানরা অনুভব করলো না। অন্যদিকে দামেশকের সাহায্যের জন্য মিসরীয় সেনাবাহিনীর আগমনের খবরও শোনা যাচ্ছিল। এ অবস্থায় মুসলমানদের হিম্মত আরো বেড়ে যাচ্ছিল। তারা অগ্রসর হয়ে মদের দোকানগুলো আক্রমণ করলো। এ অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। তিনি নিজের ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করলেন। মদের দোকান দেখলেই তার মধ্যে দলবল নিয়ে ঢুকে পড়তেন। মদের সোরাহী, জগ, কুঁজো, পেয়ালা, পিপে সব ভেঙে বাইরে ফেলে দিতেন। দোকানের সমস্ত মদ নালায় ঢেলে দিতেন। দোকানে যেসব নেশাখোর লোক এবং গুণ্ডাপাণ্ডা থাকতো তাদেরকে ইসলামের নির্দেশ বুঝাতেন, তওবা করাতেন এবং প্রয়োজনে শাস্তিও দিতেন। ইমামের এ অভিযানে সারা শহরে বিপুল প্রাণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়।

তাতারীদের অবর্তমানে সিরিয়াবাসীরা আর একটি ফিতনা নির্মূল করতে সচেষ্ট হলো। এ ফিতনাটি ছিল সীমান্ত এলাকায়। সীমান্ত এলাকায় কিছু উপজাতি ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর বিরোধী। এরা মূলত ছিল খৃস্টান এবং শিয়াদের বাতেনী, ইসমাঈলী, দ্রুজী, নুসাইরী প্রভৃতি গোমরাহ ফেরকার অন্তরভুক্ত। ৬৯৯ হিজরীতে তাতারীরা যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করে তখন এই গোমরাহ উপজাতিরা তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং মুসলমানদের যতদূর সম্ভব ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। তাতারীদের হাতে পরাজিত মুসলিম সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পলায়ন করার সময় তারা পরাজিত ও হতোদ্দম মুসলিম সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং বহু মুসলমান সৈন্য হত্যা করে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। ঘোড়াগুলো দখল করে। ইতিপূর্বে তারা কখনো মুসলিম সেনাবাহিনীর অনুগত হয়নি। কুরআন ও সুন্নায় বিধৃত আল্লাহর যথার্থ দীন গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি। কখনো ইসলামী জীবন যাপন করতেও রাজী হয়নি।

সিরিয়া শত্রুমুক্ত হবার পর আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিপদের কোনো আশংকাই থাকলো না। এ অবস্থায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া মনে করলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের চিরকালের শত্রু এই গোমরাহ সীমান্ত উপজাতিদেরকে দমন করা এবং তাদেরকে দীনের শিক্ষাদান করা উচিত। মূলত এ সময় দামেশক শহরে সরকারী প্রশাসন বলতে কিছুই ছিল না। কাজেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর দলবল ইচ্ছামতো বিভিন্ন কাজ করতে পারছিলেন। তাঁরা শুনলেন মিসরের সুলতানের সহকারী জামাল উদ্দীন আকুশ কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সীমান্তের পার্বত্য এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইমাম এ সুযোগ হাতছাড়া করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি হুয়ান এলাকার যোদ্ধা অধিবাসী ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট বাহিনী নিয়ে জামাল উদ্দীনের সাথে মিলিত হলেন। মিসর সুলতানের সহকারীর উপস্থিতির খবর শুনে গোমরাহ উপজাতিরা দলে দলে ইবনে তাইমিয়ার কাছে হাজির হতে থাকলো। ইমাম তাদের তওবা করালেন। তাদের যথার্থ ইসলামের শিক্ষা দিলেন। এতে অনেক উপকার হলো। ইতিপূর্বে মুসলমান সৈন্যদের নিকট থেকে তারা যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল তা ফেরত দেবার ওয়াদা করলো। বায়তুলমালের পক্ষ থেকে এজন্য তাদের ওপর বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হলো এবং তারা তা আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

সমকালীন পরিবেশ ঃ ইল্‌ম ও আমল

ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া হিজরী সপ্তম–অষ্টম শতকের ইসলামী বিশ্বকে এক অভিনব জীবন রসে সমৃদ্ধ করেছিলেন। হিজরী ৬৬১ সনে তাঁর জন্ম। মৃত্যু ৭২৮ সনে। ৬৭ বছর জীবনকালে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের চিন্তায়-কর্মে এক সার্থক ও যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর জীবনকালে তাতারী আক্রমণের প্রকৃতি পরিবর্তিত হলেও জোর কমেনি। এ আক্রমণের ধ্বংসকারিতা সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাতারীরা এ সময় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল–এই যা পার্থক্য।

বাগদাদ ধ্বংসের মাত্র পাঁচ বছর পর এবং তাতারীদের দামেশকে প্রবেশের তিন বছর পর তাঁর জন্ম। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধি ও বোধ শক্তির উন্মেষের পর পরই তিনি দেখেছেন চতুরদিকে তাতারী আক্রমণে বিধ্বস্ত মজলুম পরিবার। আর্ত হতাশাগ্রস্ত মুসলিমের মুখচ্ছবি তাঁর সংবেদনশীল চিত্তকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাত বছর বয়সে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন তাতারী আক্রমণের বিভীষিকা। তার নিজের শহর 'হারান' আক্রমণ করলো তাতারীরা। তাতারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য শহরের অসংখ্য পরিবারের ন্যায় তাঁদের পরিবারও দামেশকের পথে পাড়ি জমালো। পথের দু'পাশে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তাতারী আক্রমণের ধ্বংসকারিতা। আগুনে পোড়া মানুষ, গাছপালা, পশু। জনবসতিগুলো অগ্নিদগ্ধ। পংগু ছাড়া সমর্থ মানুষ কোথাও নেই। শস্যক্ষেতও বিধ্বস্ত। মোটকথা, ধ্বংসের এক বিভৎস নমুনা। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি শৈশবের এ চিত্রগুলো স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত রেখেছিল। যার ফলে পরবর্তীকালে তাতারীদের জুলুমের প্রতিবাদ করতে তিনি মোটেই পিছ-পা হননি। পরাক্রমশালী তাতারী সম্রাট কাজানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার ও তার সৈন্যদের জুলুমের কাহিনী শুনাতে তিনি একটুও বিচলিত হননি। এমনকি প্রয়োজনের সময় স্বহস্তে তরবারি নিয়ে তিনি জালেম তাতারীদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়েও পড়েছেন।

তাতারী আক্রমণের ফলে মুসলমান সমাজের বহিরংগে যে ব্যাপক বিশৃংখলা ও শক্তিহীনতা দেখা দিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ইতিপূর্বেকার আলোচনায় তা সুস্পষ্ট হয়েছে। এখন দেখা দরকার মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরের অবস্থা কি ছিল।

ইলমে কালামের দুরবস্থা

গ্রীক দর্শনের মোকাবিলা করার জন্য ইল্‌মে কালামের উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক দর্শনের চর্চা মুসলমানদের ঈমান ও আকীদায় যে বিভ্রান্তি ও দুর্বলতা সৃষ্টি করেছিল তা দূর করে তাকে সতেজ ও শক্তিশালী করাই ছিল এর লক্ষ। কিন্তু ধীরে ধীরে দর্শনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো এবং ইলমে কালাম ধর্মীয় দর্শনে পরিণত হলো। বিষয়বস্তু, আলোচনা ও যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতি সবই দর্শনের অনুরূপ। এরপরও আছে এমন সব অবান্তর আলোচনা যার সমাধানই মানুষের বুদ্ধির আয়াস-সাধ্য নয়। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী এবং এমন বহু বিষয়, যা বুদ্ধির অগম্য, বুদ্ধির সহায়তায় সেগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা। নবী ও রসূলগণের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে এগুলোর ব্যাখ্যায় নিজেদের দুর্বল ও সীমিত বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ। এ প্রচেষ্টা বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করার পরিবর্তে বরং আরো জটিল করে তুলেছিল। কুরআন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীকে এমন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে একজন সাধারণ লোকের পক্ষে তা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। যে কোনো যুগের যে কোনো পরিবেশের জন্য এ বর্ণনা পদ্ধতি সহজতর। যে কোনো পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী মানুষ কুরআনের এ বর্ণনা পদ্ধতি থেকে তার আসল বক্তব্য বিষয় সহজে জেনে নিতে পারে।

কিন্তু দর্শনের প্রভাবে ইলমে কালাম এই সহজ বিষয়টিকে কঠিন করে দিয়েছিল। সুস্পষ্ট বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছিল। সংশয় নিরশনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে কেবল সংশয় বৃদ্ধি করেছিল। তাই মুসলিম উম্মতের একটি বিরাট অংশ সব সময় ইলমে কালামের এ প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেনি। এর বিরোধিতা করে এসেছে। কাজেই এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। এমন ব্যাখ্যা যা সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সর্বশ্রেণীর মানুষের বোধগম্য এবং সবার ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। কুরআন ও সুন্নায় গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই ছিল এটা সম্ভব। যাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতি ও দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা সর্বশ্রেণীর মানুষের স্বীকৃতি আদায় করে নেবে। কুরআন ও সুন্নার ওপর তাঁর ঈমান পর্বতের ন্যায় অটল হবার সাথে সাথে কুরআন, সুন্নাহ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা ও যুক্তি হবে হৃদয়গ্রাহী ও পূর্ণাঙ্গ। প্রথম পর্যায়েই তা যেন শ্রোতা ও পাঠকের মন জয় করে নিতে পারে।

খৃস্টবাদীদের ধৃষ্টতা

অন্যদিকে খৃস্টবাদও ইসলামের বিরুদ্ধে একটা নতুন অভিযান শুরু করেছিল। খৃস্টবাদীরা নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের আন্দোলন চালাতে লাগলো। মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এ

দুঃসাহসে শক্তি যুগিয়েছিল তাদের একের পর এক ক্রুসেড যুদ্ধগুলো এবং সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও সাইপ্রাসে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত খৃস্টান সম্প্রদায়। মুসলমানদের সাথে তাত্ত্বিক মোকাবিলা করার জন্য তারা নবুওয়াতে মুহাম্মদীর ওপর আক্রমণ করে নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য বই পুস্তক রচনা করে।

খৃস্টানদের এ ইসলাম বিরোধী প্রচারণা, ধৃষ্টতা ও অপপ্রচারের জবাব দেবার জন্যও একজন শক্তিশালী আলেম ও যুক্তিবাদী লেখকের প্রয়োজন ছিল। খৃস্টবাদ ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তার ব্যাপক পড়াশুনা ও বিপুল পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল। ধর্মগুলোর তুলনামূলক জ্ঞান ও আসমানী কিতাবগুলোর বিকৃতির ইতিহাস ও ধারা সম্পর্কে তার এমন সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবার প্রয়োজন যার মাধ্যমে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা সপ্রমাণ করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে পারেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া যে যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে যুগে মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় বাইরের ও ভেতরের এমনি অসংখ্য সংকটের মোকাবিলা করছিল। ছশো সাড়ে ছশো বছর একটা জাতির সত্যের ওপর টিকে থাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। এজন্য একশো বছর সময় কালও অনেক বেশি বলে বিবেচিত হয়। অতীতের জাতিদের জন্য যে সব কারণে নবী ও রসূলগণের আবির্ভাব হতো সাড়ে ছশো বছর পর মুসলমানদের জন্য সে সব কারণই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নবুওয়াতের সিলসিলা খতম হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ইবনে তাইমিয়ার ন্যায় মুজাদ্দিদরাই দীনের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব পালন করেন।

বাতেনী ফিত্‌না

সপ্তম হিজরী শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের মধ্যে বাতেনীদের তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করে। হিজরী চতুর্থ শতকের গ্রীক দর্শনের ছত্রছায়ায় এ ফিতনাটির জন্ম। পঞ্চম শতকে ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সর্বশক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করেন। কিন্তু ফিতনাটিকে নির্মূল করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেড়শো বছরের মধ্যে ফিতনাটি আবার তার বিপুল ভয়াবহতা নিয়ে মিল্লাতে ইসলামীয়ার ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। বাতেনীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষাবলীর মধ্যে ইরানের অগ্নি উপাসকদের আকীদা-বিশ্বাস, প্লেটোর চিন্তাধারা এবং ভয়াবহ রাজনৈতিক স্বার্থবাদিতার অশুভ সমাবেশ ঘটে। তাদের ইসমাঈলী, হাশাশী, দ্রুযী, নুসাইরী প্রভৃতি শাখাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব সময় তৎপর থাকে। মুসলমান ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর যে কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে তারা সবসময় সহায়তা করে এসেছে। এমনকি অধিকাংশ সময় তাদেরই তৎপরতা ও চক্রান্তে বাইরের শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পেয়েছে।

সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ইউরোপীয় খৃস্টানদের ক্রুসেড যুদ্ধের সময় তারা ক্রুসেডারদের সহায়তা করেছে। ক্রুসেডাররা সিরিয়া দখল করার পর

বাতেনীদেরকেই নিজেদের বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধুর স্থান দেয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তাদের সাহায্যের প্রতিদান দেয়। পরবর্তীকালে জংগী সুলতানদের সিরিয়া পুনরদখলের সময় এবং আইউবী সুলতানদের আমলেও তারা হামেশা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে লিপ্ত থাকে। অষ্টম শতকে তাতারীরা সিরিয়া আক্রমণ করলে তারা প্রকাশ্যে তাতারীদের সাহায্য করে। এর ফলে মুসলমানেরা ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হন।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাতেনীরা হামেশা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি, ইসলামের প্রতি মুসলমানদের আস্থা দুর্বল করে দেয়া, ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনকে বিদ্রোহী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী আকীদা বিশ্বাস প্রচারে নিয়োজিত থেকেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় দুর্গটি শত্রুপক্ষের হাতে সোপর্দ করার জন্য তারা সবসময় গোয়েন্দাগিরি করে এসেছে।

হিজরী পঞ্চম শতকে ইমাম গাযালী রঃ এ ফিতনাটির তাত্ত্বিক মোকাবিলা করেছিলেন। অষ্টম শতকে এসে এর কেবল তাত্ত্বিক মোকাবিলাই যথেষ্ট ছিল না বরং এই সংগে কার্যত একে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে মিল্লাতে ইসলামিয়াকে চিরকালের জন্য এর হাত থেকে নিস্কৃতি দেবার প্রয়োজন ছিল।

ভ্রান্ত তাসাউফ ও শিরকের প্রসার

এ যুগে আর একটি ফিতনা প্রসার লাভ করেছিল তাসাউফপন্থীদের মধ্যে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জাতির চিন্তা ও কর্মধারার সংস্পর্শে এসে এবং এই সঙ্গে আসল ইসলামী চিন্তা ও কর্মধারা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে গ্রীক, ইশরাকী, বেদান্ত ও বৌদ্ধ মহানির্বানবাদী দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কয়েক শতকের প্রচার ও প্রচলনের ফলে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলোর সুক্ষ্ম অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই অনৈসলামী আকীদাগুলোকে চিহ্নিত করে সেখান থেকে এগুলোকে ছেঁকে বের করে আনা মোটেই সহজতর ছিল না। নয়া প্লেটোবাদ, যোগবাদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের সীমা নির্দেশ, একজনের বক্ষদেশ থেকে আরেকজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার, কামেল পীর মুরশীদ এবং আল্লাহর প্রেমে পাগল মাজযুবের জন্যে শরীয়তের আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার প্রয়োজন নেই, প্রভৃতি মুশরিকী চিন্তা-বিশ্বাস আহ্‌লে তাসাউফদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের আমল থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে আসছিল। কিন্তু হিজরী অষ্টম শতকে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে তার স্বচ্ছ কর্মধারায় আবর্জনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেলো যে, আহ্‌লে ইলমদের এক বিরাট গোষ্ঠীও এই আবর্জনা ধোয়া

পানি পান করেই নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতে থাকলো। ফলে মুসলিম জনতার বিরাট অংশও যে তাদের অনুসারিতায় এ গোমারাহীতে লিপ্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই সংগে দীর্ঘকাল থেকে অমুসলিমদের সংগে মেলামেশা, আজমী প্রভাব এবং উলামায়ে কেরামের গাফলতির কারণে মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেক প্রকার মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মধারা প্রসার লাভ করেছিল। নির্ভেজাল তওহীদের ওপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবরণ পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহর ওলি ও তাঁর নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলমানরাও বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। আল্লাহর মৃত নেক বান্দাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজের দিলের মাকসুদ পুরা করার জন্য তাদের মাজারে ধরণা দিতে ও তাদের কাছে মুনাজাত করতে সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা অনেক আলেমও একটুও ইতস্তত করতেন না। মুসলমানরা অমুসলিমদের পূজা-পার্বন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত থাকতো, তাতে শরীক হতো এবং নিজেরাও তাদের বহু অনুষ্ঠান পালন করতো।

এই সব মুশরিকী জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার এবং খালেস তওহীদের দিকে পূর্ণ শক্তিমত্তা সহকারে মুসলমানদের আহবান জানাবার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদ আলেমের প্রয়োজন ছিল, যিনি তওহীদ ও শিরকের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, যিনি জাহেলীয়াতের সবরকমের চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল, যে কোনো চেহারায় ও যে কোনো পোশাকে জাহেলীয়াত উপস্থিত হোক না কেন, তাকে চিনে ফেলতে যার এক মুহূর্তও দেরী হবে না, যিনি তওহীদে খালেসকে উলামায়ে কেরামের কিতাব থেকে, জাহেল মুসলমানদের আমল থেকে এবং যুগের প্রতিষ্ঠিত রীতি রেওয়াজ থেকে নয় বরং সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের আমল ও জীবনধারা থেকে জেনেছেন ও গ্রহণ করেছেন। নির্ভুল আকীদা ও আমলটি জানার পর সেটি ঘোষণা করার ব্যাপারে তিনি কোন শাসকের রক্তচক্ষু ও বিশাল জনতার পর্বত প্রমাণ বিরোধিতার পরোয়া করেন না।

উলামায়ে কেরামের দুর্বলতা

এই সংগে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাবকালে মিল্লাতে ইসলামীয়ার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল উলামায়ে কেরামের মধ্যে। উলামায়ে কেরামের মধ্যে ও দীনী শিক্ষায়তনগুলোতে এক প্রকার জড়তা ও স্থবিরতা বাসা বেঁধেছিল। নিজেদের ফিক্হী পদ্ধতি, মযহাব ও নিজেদের ইমামের ফিকহী চিন্তার বাইরে গিয়ে কিছু করাকে তারা হারাম মনে করতেন। ফিক্হকে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে বিচার না করে কুরআন হাদীসকে নিজেদের ফিক্হর দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করতেন। ফিক্হর

মতবিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসকে বিচারকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় কুরআন ও হাদীসকে তার সথে সামঞ্জস্যশীল করার প্রচেষ্টা চালানো হতো।[১] ইসলামী সমাজে অনেক নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, যেগুলো সমাধান করার জন্য নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেদিকে ছিল না। তারা নিজেদের অক্ষম মনে করতো। এক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলেমের প্রয়োজন ছিল।

জ্ঞান চর্চা ও মযহাবী সীমাবদ্ধতা

ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে কেবল অনুমোদন ও উৎসাহ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং জ্ঞানানুশীলন মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য গণ্য করেছে। রাজবংশের উত্থান-পতন, রাজশক্তির ভাঙ্গাগড়া, বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও মুসলমানদের জ্ঞানের চর্চা কখনো থেমে যায়নি। এমনকি খিলাফতে রাশেদার শেষের দিকে এবং উমাইয়া রাজবংশের স্থিতিশীলতা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সারা ইসলামী বিশ্বে যে ব্যাপক নৈরাজ্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে, তখনো একদল লোক জ্ঞানচর্চায় নিজেদের উৎসর্গীত করে। হাদীস সংগ্রহ, হাদীসের দরস, ফিক্‌হর আলোচনা, হাদীস ও ফিক্‌হ গ্রন্থ প্রণয়ন, আরবী ব্যাকরণ, সীরাত, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চা ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চলে স্বাভাবিক নিয়মে।

সাতশো হিজরীতে পৌছুতে পৌছুতে জ্ঞানচর্চা অনেক ব্যাপকতা লাভ করে। শাসক সমাজ হামেশা জ্ঞানানুশীলনে সহায়তা দান করেন। আইউবী ও মামলুক সুলতানগণ মিসর ও সিরিয়ায় বড় বড় জামেআ ও দারুল হাদীস কায়েম করেন। এসব শিক্ষা কেন্দ্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য ছাত্র এসে শিক্ষালাভ করতে থাকে। এ শিক্ষায়তনগুলোর সাথে সাথে বড় বড় লাইব্রেরীও গড়ে ওঠে। এ লাইব্রেরীগুলোতে সকল শাস্ত্রের ও ইলমের বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে বিদগ্ধ সমাজ সমানভাবে এ লাইব্রেরীগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারতো। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি এত বড় ছিল যে, সারা দুনিয়ার কিতাব এখানে সংগৃহীত ছিল বলে মনে করা হতো। এর মধ্যে একমাত্র ৬২১ হিজরীতে আলকামেল মুহাম্মদ আইউবি প্রতিষ্ঠিত জামেআ কামেলিয়ার লাইব্রেরীতে এক লক্ষ কিতাব সংগৃহীত ছিল।

---

(১) অথচ কুরআনে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

অর্থাৎ কোনো বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ হলে তোমরা আল্লাহর কিতাব ও

সপ্তম-অষ্টম হিজরীতে অনেক বড় বড় ও বিশ্ববিখ্যাত আলেমের আবির্ভাব ঘটে। আল্লামা তাকীউদ্দীন আবূ আমর ইবনুস সালাহ (৫৭৭–৬৩৪ হিঃ), শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (৫৭৮–৬৬০ হিঃ), ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (৬৩১–৬৭৬ হিঃ), শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ (৬২৫–৭০২ হিঃ), আল্লামা আলাউদ্দীন আলবাজী (৬৩১–৭১২ হিঃ), আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ আস-সাফী (৬৫৪–৭৪২), হাফেজ ইলমুদ্দীন আলবারযালী (৬৬৫–৭৩৯ হিঃ) এবং আল্লামা শামসুদ্দীন আযযাহাবী (৬৭৩–৭৪৮ হিঃ) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ এই যুগকে বিশিষ্টতা দান করেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ এদের এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত হয়।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা তাকিউদ্দীন ইবনুস সালাহের 'মুকাদ্দামাহ', শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের 'আলকাওয়ায়েদুল কুবরা', ইমাম নববীর 'মাজমু' ও 'শারহে মুসলিম', ইবনে দাকীকুল ঈদের 'কিতাবুল ইমাম' ও 'আহকামুল আহকাম শারহে উমদাতিল আহকাম' আবুল হাজ্জাজ আলমাযীর 'তাহযীবুল কামাল' এবং আল্লামা যাহাবীর 'মীযানুল ইতিদাল' ও 'তারিখুল ইসলাম' সবচাইতে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তবে এ সময়ের ইল্‌ম সম্পর্কে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়। তা হচ্ছে এই যে, এ সময়ের জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে ব্যাপকতা ছিল বেশি, গভীরতা ছিল তার তুলনায় অনেক কম। গভীর চিন্তা ও গবেষণার পরিবর্তে পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের সংকলন ও তার ব্যাখ্যার প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। এ পর্যন্ত ফিকহী মযহাবগুলোর যে শক্তিশালী প্রাসাদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল তার চারদেওয়ালের বাইরে আসার ক্ষমতা তাদের ছিল না। চার মযহাবকে মুখেই কেবল সত্য বলে মেনে নেয়া হয়েছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেতো প্রত্যেক মযহাবের অনুসারী কেবল নিজের মযহাবকেই অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করছে। অন্য মযহাবের মধ্যে নিখাদ সত্য থাকতে পারে, এ কথা বলতে তাদের দ্বিধা ছিল। বড় জোর তারা এতটুকু মনে করতো ঃ আমাদের ইমাম যে ইজতিহাদ করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল, তবে তার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা আছে। আর অন্য ইমামদের ইজতিহাদ সবই ভুল, তবে তার মধ্যে সত্য ও নির্ভুলের সম্ভাবনা আছে।

মযহাবের অনুসারীদের নিজের ও অন্যের মযহাব সম্পর্কে এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। তারা নিজের মযহাবকে অন্য সমস্ত ফিক্‌হী মযহাব থেকে শ্রেষ্ঠ এবং তার পেছনে আল্লাহর সমর্থন আছে বলে মনে করতো। নিজেদের মযহাবকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য তারা নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা, ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও লেখনী শক্তি নিয়োগ করতো। মযহাবের অনুসারীরা নিজেদের মযহাবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতো তাকে কত উর্ধে স্থান দিতো এবং নিজেদের মযহাব সম্পর্কে তারা কি ধারণা পোষণ করতো,

সুলতান আলমালিকুয যাহের বেইবারসের একটি শাসন সংস্কার থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আগের শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী মিসর ও সিরিয়ায় কেবলমাত্র শাফেয়ী 'কাযীউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত ছিলেন। সুলতান বেইবারস সেস্থলে অন্য তিন মযহাবের 'কাযীউল-কুযাত'ও নিযুক্ত করেন এতে শাফেয়ী আলেমগণ ভীষণ বিক্ষুব্ধ হন। তারা নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা মিসরকে একমাত্র শাফেয়ী কাযীউল-কুযাতের অধীন দেখতে চাচ্ছিলেন। তারা মনে করতেন শাফেয়ী মযহাব মিসরে সবচাইতে প্রাচীন এবং এদেশের মাটিতে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সমাধিও রচিত হয়েছে। কাজেই এ দেশে একমাত্র শাফেয়ী মযহাবের অধিকারই ন্যায়সঙ্গত। তাই বেইবারসের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা স্থানান্তরিত হলে শাফেয়ী আলেমগণ এটাকে শাফেয়ী মযহাবের প্রতি তার বেইনসাফী ও অন্যায় আচরণের আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ফিক্হী মযহাবের ক্ষেত্রে একদিকে এই বাড়াবাড়ির সাথে সাথে আবার চলছিল কালাম শাস্ত্রকারদের বিরোধ। এ ক্ষেত্রে হাম্বলী ও আশআরীদের বিরোধ ছিল তুংগে। ফিক্হী মযহাবগুলোর অনুসারীদের নিজেদের শত বিরোধ সত্ত্বেও পারস্পরিক মোলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো ভাটা পড়েনি। বরং তাদের অনেকের মধ্যে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কও ছিল। তাই সেখানে পারস্পরিক সম্মানবোধের একটা সুযোগ ছিল। তারা পরস্পর বিতর্ক করতেন। কিন্তু সে বিতর্ক নিজের মযহাবকে শ্রেষ্ঠ ও সত্য প্রমাণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু হাম্বলী ও আশআরীদের মধ্যে বিরোধ কুফরী ও ইসলামের সীমান্তে চলে যেতো। তারা পরস্পরকে ইসলাম থেকে খারিজ করার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে মানতেক ও কালাম শাস্ত্রের গালভরা বুলি সহকারে যখন বিতর্কে নামা যায় তখন তাকে ইসলাম বা কুফরীর সীমান্তে পৌঁছানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। ধীরে ধীরে শাসক সমাজ ও জনগণ সবাই এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে এবং এর মধ্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করে।

অন্যদিকে তাসাউফের অবস্থাও ছিল আরও সংগীন। বহুতর অনৈসলামী চিন্তা-ভাবধারা ও পদ্ধতি এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। অসংখ্য পেশাদার, মূর্খ ও বেদাতী সুফী এ পদ্ধতিতে বেশ জমিয়ে বসে। সাধারণ মানুষদের সাথে সাথে শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট অংশও ভণ্ড ও গায়ের ইসলামী সুফীদের খপ্পরে পড়ে যায়। এভাবে মুসলমানদের দীন ও ঈমান বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়। দার্শনিকদের একটি দল অহী ও নবুওয়াতের শিক্ষা ও সীমানা ডিঙিয়ে স্বাধীন চিন্তার অনুবৃত্তিতে মেতে ওঠেন। একদল তো ধর্মকে দর্শনের লেজুড় হিসেবে

দাঁড় করাবার চেষ্টা চালান। দার্শনিকদের এ উভয় দলই প্লেটো ও এরিস্টটলের ছিল অন্ধ অনুসারী। এ অবস্থার মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ঈমান, ইলম ও আমলের উজ্জ্বল মশাল হাতে এগিয়ে আসেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

অষ্টম হিজরী শতকে মুসলিম মিল্লাত ভিতরে বাইরে এমন সব সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল, যা থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য একজন শক্তিশালী সংস্কারক, মুজাদ্দিদ ও মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল। এই সমস্যায় জর্জরিত বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজকে যথার্থ ইসলামের পথে পরিচালিত করার যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পাঠান।

ইবনে তাইমিয়ার দীনী সংস্কারমূলক কার্যাবলী অনুধাবন করার জন্য তাঁর যুগের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা একান্ত অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে তাতারীদের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার কথা কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন ইসলামী বিশ্বের যে এলাকায় তাঁর জন্ম হয় এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র যে এলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা অবহিতির প্রয়োজন। ইবনে তাইমিয়ার জন্মের তের বছর পূর্ব থেকে মিসর ও সিরিয়ার ওপর মামলুক সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। এ মামলুক সুলতানরা ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবীর রাজবংশের শেষ সুলতান আল মালিকুস সালেহ নজমুদ্দীন আইউবের (মৃঃ ৬৪৭ হিঃ) তুর্কী গোলাম। সুলতান নজমুদ্দীন আইউব তাদের বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর মিসরে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। ৬৪৭ হিজরীতে আল মালিকুস সালেহের ইন্তিকালের পর তুরান শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু ইয্যুদ্দীন আইউব তুর্কমানী নামক জনৈক মামলুক তাঁকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসেন এবং আলমালিকুল মুঈয নাম গ্রহণ করেন। ৬৫৭ হিজরীতে ইয্যুদ্দীন আইবকের গোলাম সাইফুদ্দীন কাতার সিংহাসন দখল করেন। এই মুসলিম সুলতানই সর্ব প্রথম অজেয় বলে কথিত তাতারীদেরকে পরাজিত করেন। পরের বছরে সুলতান নজমুদ্দীন আইউবের দ্বিতীয় গোলাম রুকনুদ্দীন বেইবারস সাইফুদ্দীন কাতারকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি আলমালিকুয যাহিদ উপাধি ধারণ করেন। বেইবারস অত্যন্ত শক্তিশালী সুলতান ছিলেন। একই সাথে তাতারী ও ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করেন এবং উভয়কে পরাজিত করেন। বারবার পরাজিত করেন। একই সংগে ইসলমী বিশ্বের দুই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের মধ্যে তাঁর কর্তৃত্বের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

তাঁরই শাসনামলে সিরিয়ায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্ম হয়। ইমামের বয়স যখন পনের বছর তখন আল মালিকুয্ যাহির রুকনুদ্দীন বেইবারসের ইন্তিকাল হয়।

ইমাম তখন কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হতে চলেছেন। শৈশবে যেখানে তিনি দেখেছিলেন চতুরদিকে হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি সেখানে যৌবনে পৌঁছতেই হতাশার মেঘ কাটতে শুরু করেছিল। মহান সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবী যেমন হতাশাগ্রস্ত মিল্লাতের জড়তা ভেঙ্গে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বাত্মক জিহাদে লিপ্ত করেছিলেন এবং ইসলামী বিশ্বে এক নতুন প্রাণবন্যা সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি মালিকুয্ যাহির বেইবারস স্থবির অবসাদগ্রস্ত মিল্লাতের বুকে আর একবার প্রাণ সঞ্চার করেন। চতুরদিকে তাতারী ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একটি জিহাদের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক ইবনে কাসির সুলতান সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"বেইবারস ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্নত ও বলিষ্ঠ হিম্মতের অধিকারী সাহসী বাদশাহ। শত্রুদের সম্পর্কে তিনি কখনো গাফেল থাকতেন না। সব সময় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। তিনি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল মুসলমানদের সুশৃংখলাবদ্ধ ও একত্রিত করেন। সত্যি বলতে কি, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই শেষ যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা দান এবং তাদের শক্তিশালী করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ফিরিংগী, তাতারী ও মুশরিকদের চোখে তিনি কাঁটার মতো বিধতেন? তিনি মদ নিষিদ্ধ করে দেন। ফাসেক, ফাজের, গুন্ডা, বদমাশদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। দেশের কোথাও কোনো বিপর্যয় বিশৃংখলা দেখলে তা দূর না করা পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না।"

মালিকুয্ যাহির বেইবারসের রাজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। পূর্ব দিকে ফোরাত নদী থেকে দক্ষিণে সুদান পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজ্যের শেষ সীমানা। মিসর ছিল এই রাজ্যের কেন্দ্রীয় এলাকা এবং কায়রো ছিল রাজধানী। কায়রোর গুরুত্ব এ সময় আরো বেড়ে গিয়েছিল বগদাদ থেকে বিতাড়িত আব্বাসী 'খলীফাদের' এখানে অবস্থানের কারণে। বাগদাদ তখনো ছিল তাতারীদের অধীনে। বাগদাদের তাতারী বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা অমুসলিমদের অধীনে থাকে। অন্যদিকে আব্বাসী 'খলিফাগণ' তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বহারা হলেও মুসলমানদের ওপর তাঁদের 'রূহানী' কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। কায়রো থেকেই তাঁরা ইসলামী বিশ্বে তাঁদের সেই রূহানী কর্তৃত্ব চালাতে থাকেন।

বেইবারস একজন মহান বাদশাহ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু হাজার গুণাবলী ও সৎকর্ম সত্বেও তিনি ছিলেন একজন একনায়ক বাদশাহ। তাই মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী চেতনা ফিরিয়ে এনে ইসলামের দুশমনদের শোচনীয় পরাজয় বরণে বাধ্য করে তিনি যেমন একদিকে একটি বিরাট দায়িত্ব পালন করেন তেমনি অন্যদিকে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তার আমলে জুলুম অত্যাচারের ঘটনাও কিছু ঘটে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আমলকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের জাগরণের যুগ বলা যায়।

৬৭৬ হিজরীতে ১৮ বছর রাজত্ব করার পর মালিক বেইবারস ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর মুসলমানদের আবার দুর্দিন শুরু হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর ৩৩ বছরের মধ্যে ৯ জন সুলতান মিসরের সিংহাসনে বসেন। তাদের মধ্যে একমাত্র যিনি কিছুটা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আল-মালিকুল মনসুর সাইফুদ্দীন কালাউন। তিনি ৬৭৮ হিজরীতে তাতারীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণে বাধ্য করেন। এই সঙ্গে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধেও জিহাদ পরিচালনা করেন। ১৮৫ বছর পর তিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে তারাবিলাস উদ্ধার করেন। ১২ বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত শান শওকতের সাথে রাজত্ব করেন। ৬৮৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর মিসরের সিংহাসন ক্ষমতা-লোভীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয় এবং বছরে বছরে একের পর এক বাদশাহর পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে ৭০৯ হিজরীতে আল-মালিকুল মনসুরের পুত্র আল-মালিকুন নাসের কালাউন তৃতীয় বার সিংহাসন দখল করেন। এবার তাঁর আসন স্থায়ী হয়। তিনি ৩২ বছর দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন চালিয়ে যান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন আসলে এই আল মালিকুন নাসের কালাউনের সমসাময়িক। তাঁরই আমলে ইমাম তাঁর তাত্ত্বিক ও সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন। এই সুলতান অনেকটা আল-মালিকুয্ যাহির বেইবারসের যুগ ফিরিয়ে এনেছিলেন। বেইবারসের ন্যায় তিনিও অনেক উন্নত গুণের অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে আবার জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তাতারীদের তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ইসলামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করেন।

সমাজে তুর্কী ও তাতারীদের প্রভাব

হিজরী অষ্টম শতকে ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি যে সমাজে তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলীর সূচনা করেন সে সমাজটির অনেক চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। শাসক সমাজ ছিলেন তুর্কী। তুর্কীরা নিজেদেরকে আরবদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। সব ব্যাপারেই প্রায় তারা সাধারণ লোকদের থেকে নিজেদেরকে বিশিষ্ট হিসেবে চিত্রিত করতো। তাদের ভাষা ছিল তুর্কী। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং উলামা ও সাধারণ লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় তারা আরবী ব্যবহার করতো।

তবে তুর্কী শাসকগণ আলেম ও সুফীদের শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের কথা মেনে চলতেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখাতেন। সরকারী পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা কোনো বংশ বা শ্রেণীর প্রাধান্য দিতেন না। তবে শাসক সমাজ তুর্কী হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে

তুর্কীদেরই নিযুক্তি হতো। তুর্কী ও তাতারীরাই ছিল বড় বড় জমিদার ও জায়গীরদার।

অন্যদিকে আবার শহরের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ ছিল তাতারী বংশোদ্ভূত। সাইফুদ্দীন কাতার, যাহের বেইবারস, নাসেরুদ্দীন কালাউন প্রমুখ তুর্কী বাদশাহগণ তাতারীদের সাথে যেসব যুদ্ধ করেছিলেন তাতে অসংখ্য তাতারী গ্রেফতার হয়। এই তাতারীরা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে সিরিয়া ও মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ঐতিহাসিক মির্করিযীর বর্ণনা মতে যাহের বেইবারসের সময় মিসর ও সিরিয়ায় তাতারীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাদের রীতিনীতি ও আচার আচরণ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও নিজেদের বহু রীতিও আচার অক্ষুণ্ন রেখেছিল। নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট তারা বজায় রেখেছিল। আসলে নওমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজেদের অতীত আচার-আচরণ, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট এমনকি জাহেলী আকীদা বিশ্বাস পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছে এবং জাহেলিয়াতের সবকিছু বাদ দিয়ে ইসলামকে শতকরা একশোভাগে গ্রহণ করেছে–এর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। অবশ্য এটা ছিল একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁদের জীবনধারা, চিন্তা-আকীদা, আচার-আচরণ সবকিছুকেই আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী পুনরগঠিত করেন। জাতীয় ও গোত্রীয় বৈশিষ্টের কোনো তোয়াক্কাই তাঁরা করেননি। তাঁরা আল্লাহ ও রসুল যা হুকুম দিয়েছেন তাই করেছেন। আল্লাহ ও রসূল যেভাবে জীবন-যাপন করতে বলেছেন সেভাবে জীবন যাপন করেছেন। তাঁদের জীবনে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সহ-অবস্থান ছিল না। সেখানে শুধু ইসলামই ইসলাম ছিল। জাহেলিয়াত সেখান থেকে চির বিদায় নিয়েছিল। তাঁদের অবস্থা দেখে মনে হতো ইসলামের মধ্যে তাদের পূনরজন্ম হয়েছে।

তবে এ তাতারী ও তুর্কীদের দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ তারা যে সময় ইসলামে প্রবেশ করেছিল সে সময়কার সমাজে পূর্ণাংগ ইসলাম অনুপস্থিত ছিল। যে সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও অনুশীলনের পুর্ণাংগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং নবাগতদের গ্রহণ করে তাদের জীবনাধারাকে ইসলামী অনুশাসন মোতাবিক ঢালাই করার ক্ষমতা যে সমাজ হারিয়ে ফেলেছিল সে সমাজের আওতায় এসে তুর্কী ও তাতারীরা তাদের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে ফেলবে এবং নিজেদের সমস্ত আকীদা, বিশ্বাস, জাতীয় বৈশিষ্ট ও আচার-আচরণ ত্যাগ করে স্বতস্ফুর্তভাবে খাঁটি মুসলমানে পরিণত হবে, একথা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে। বাস্তবে এর সাক্ষাত পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। তাই দেখা যায়, এই তুর্কী ও তাতারী বংশোদ্ভুত মুসলমানদের জীবনে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সহাবস্থান। পরবর্তীকালে বিশ্ব ইসলামের ইতিহাসে এর দুষ্ট প্রভাব ও অনিষ্টকারিতা দেখা যায় সুস্পষ্ট।

ঐতিহাসিক মিকরিযী তাতারী মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেনঃ এই তাতারীরা শিক্ষালাভ করেছিল দারুল ইসলামে। তারা ভালোভাবে কুরআন শিখেছিল। ইসলামের বিধান ও আইন-কানুনগুলোও তারা পাকাপোক্তভাবে শিখে নিয়েছিল। কিন্তু তাদরে জীবন ছিল হক ও বাতিলের সমন্বিত রূপ। সেখানে যেমন ভালো জিনিস ছিল তেমনি তার পাশাপাশি ছিল খারাপ জিনিসও। তারা নিজেদের দীনি বিষয়াবলী যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, আওকাফ, এতিমদের বিষয়াবলী, স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ, ঋণ বিষয়ক বিবাদ প্রভৃতি বিষয় কাজীর হাতে ন্যস্ত করতো। কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত ও প্রাইভেট বিষয়াবলীতে চেংগীজী আচরণ ও ঐতিহ্য এবং আসসিয়াসার (তাতারী আইন) অনুসারী হতো। তারা নিজেদের জন্য 'হাজেব' নামে একজন শাসক নিযুক্ত করতো। এই হাজেবরা তাদের দৈনন্দিন ঘটনাবলীতে সিদ্ধান্ত দিতো, শক্তিশালীদেরকে শৃংখলা ও আইনের পাবন্দ রাখতো এবং 'আসসিয়াসা' অনুযায়ী দুর্বলদেরকে তাদের অধিকার দান করতো। অনুরূপভাবে বড় বড় তাতারী ব্যবসায়ীদের বিষয়াবলীর ফায়সালাও আসসিয়াসা অনুযায়ী হতো। জায়গীর ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে এই জাতীয় আইনের মাধ্যমেই তারা ফায়সালা করতো।

এই তুর্কী বংশোদ্ভুত আজমী ও তাতারী নও-মুসলিমদের চরিত্র, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও জীবন ধারার প্রভাব প্রাচীন আরব বংশোদ্ভুত ও অন্যান্য মুসলিম জনবসতির উপর পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যেমন দেখা যায় এশীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মিলন ও মিশ্রণ তেমনি তাতারীদের বিজয়ী ও বিজিত হওয়া উভয় অবস্থাই মুসলিম ও তাতারী সংস্কৃতির মিশ্রণের পথ উন্মুক্ত করে। যুদ্ধের ময়দানে জয়-পরাজয়ের ন্যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জয়-পরাজয় ঘটে এবং একে অন্যের প্রভাব গ্রহণ করে।

এই তাতারী প্রভাব গ্রহণ মুসলমান সমাজের জন্য মোটেই সুখকর হয়নি। বিশেষ করে তারা আসসিয়াসার মাধ্যমে যেভাবে ব্যক্তিগত বিষয়াবলীকে ইসলামী বিধি-বিধানের আওতা বহির্ভূত রাখার চেষ্টা করে, তা সেকালের মুসলিম সমাজের ক্ষতির পসরাই বৃদ্ধি করেছিল মাত্র। কারণ খিলাফতে রাশেদার অবসানের পর মূল রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনা দীনের বাঁধনমুক্ত হবার প্রচেষ্টায় নিরত হয়। সাতশো বছরের একনায়কত্বমূলক রাজতান্ত্রিক শাসন দীন ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ব্যাপারটিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ সময় তাতারীদের আসসিয়াসার ব্যবস্থাপনা মুসলমানদের দীন ও রাষ্ট্রের এই পৃথকীকরণের ব্যাপারটিকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। তাই তাতারীদের মুসলিম সমাজভূক্তি একদিকে যেমন মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিল তেমনি অন্যদিকে দীনি ক্ষেত্রে তাদের ক্ষতি বৃদ্ধিই করেছিল। ইসলামী সমাজে গোমরাহীর পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। এই গোমরাহী থেকে ইসলামী সমাজকে মুক্ত করার জন্য ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার মতো মুজাদ্দিদের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

ইমামের সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়

ইল্‌মি ঘরানা

অষ্টম হিজরী শতকে ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ইসলামী পুনরজাগরণে যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার মূলে তাঁর খান্দানের অবদানও কম ছিল না। সমগ্র পরিবারটিকেই একটি 'ইলমী ঘরানা' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর পরিবারের চতুর্থ পুরুষ ছিলেন তাঁর পরদাদা মুহাম্মদ ইবনুল খিযির। এই মুহাম্মদ ইবনুল খিযিরের মাতার নাম ছিল তাইমিয়া। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। বাগ্মীতায় তাঁর অসাধারণ খ্যাতি কিছু দিনের মধ্যে পরিবারটিকে তাইমিয়া পরিবার নামে সর্বত্র পরিচিত করে।

শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়ার দাদা আল্লামা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী মযহাবের শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। হাদীসের 'রিজাল' শাস্ত্রে পারদর্শী ইমাম হাফেজ যাহাবী তাঁর 'নিবলা' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া ৫৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নিজের চাচা বিখ্যাত খতীব ও বাগ্মী ফখরুদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার কাছে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর হিরান ও বাগদাদের আলেম ও মুহাদ্দিসদের কাছে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। ফিকহে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বলা যায়। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ফিকহে গভীর পাণ্ডিত্য সর্বত্র প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত ছিল। একবার জনৈক আলেম তাঁকে একটি ইলমী প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, প্রশ্নটির ৬০ টি জবাব দেয়া যেতে পারে। এরপর একের পর এক করে ষাটটি জবাব দিয়ে গেলেন। ৬৫২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুনতাকিউল আখবার'। এ গ্রন্থে তিনি প্রত্যেকটি ফিক্‌হী অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহের উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর উপর মযহাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ শওকানী, 'নাইলুল আওতার' নামে বারো খণ্ডের এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর গভীরতা ও এর শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পিতা শিহাবুদ্দীন আবদুর হালীম ইবনে তাইমিয়াও একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। হিরান থেকে দামেশকে চলে আসার পরপরই তিনি দামেশকের জামে উমুবীতে দরসের সিলসিলা জারি করেন। দামেশকের এ কেন্দ্রীয় মসজিদটি ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ উলামা,

ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কেন্দ্রস্থল। কাজেই দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের উপস্থিতিতে দরস দেয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। তাঁর দরসের বৈশিষ্ট ছিল এই যে তিনি মুখে মুখে দরস দিতেন। সামনে কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থের স্তুপ থাকতো না। সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বড় বড় গ্রন্থের বরাত দিয়ে যেতেন। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর তাঁর নির্ভরতা ছিল অত্যধিক। এই সংগে তিনি দামেশকের দারুল হাদীস আসসিকরিয়ায় শায়খুল হাদীস নিযুক্ত হন। ৬৮২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

শৈশব ও কৈশোর

দাজলা ও ফোরাতের দোয়াব অঞ্চল দুভাগে বিভক্ত। এর দক্ষিণ ভাগের এলাকাগুলোকে ইরাকে আরবী বলা হয়। বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি শহরগুলো এর অন্তরভূক্ত। আর উত্তর ভাগের এলাকাগুলো প্রাচীন আরবী সাহিত্যে দিয়ারে বাকার, দিয়ারে রাবীআ ও দিয়ারে মুদার নামে উল্লেখিত হয়েছে। আরব ভৌগোলিকরা এ এলাকাকে বলেন আলজাযীরাহ। এর উত্তরে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ইরাকে আরবী, পূর্বে কুর্দিস্তান এবং পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া মরুভূমি। এই এলাকায় আররিহা অবস্থিত। আররিহার দক্ষিণে প্রায় ৮ ঘন্টা চলার পর যে শহরটিতে প্রবেশ করা যায় তার নাম হিরান। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পূর্ব পুরুষগণ এই হিরান শহরের অধিবাসী। ৬৬১ হিজরীর ১০ রবিউল আউয়ালে এই শহরে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্ম। ইতিপূর্বে আমরা ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার জন্ম এবং শৈশবেই তাতারীদের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাদের দামেশকে হিজরাতের কথা বর্ণনা করেছি। তখন ইমামের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। তাতারী আক্রমণের দিনগুলি ছিল অত্যন্ত ভীতি, আশংকা ও ভয়াবহতায় পরিপূর্ণ। মানুষ নিজের সব কিছু পানির দরে বিক্রি করে দিয়ে শুধুমাত্র প্রাণটুকু নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। এই ভীতি ও আতংকের দিনে ইমামের পরিবারও দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সব কিছু বিক্রি করা যায় কিন্তু পরিবারের কয়েক পুরুষ থেকে সঞ্চিত তাদের ইলমী মিরাস পারিবারিক পাঠাগারটি বিক্রি করতে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। জান যায় যাবে তবুও এ বিশাল পাঠাগারটি মাথায় করে নিয়ে হলেও তারা পথ অতিক্রম করবে, এ ছিল পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের সংকল্প। ফলে এই ইলমী ঘরানাটি তাদের অনেক পারিবারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদ দিয়ে কিতাবগুলো গাড়ি বোঝাই করতে লাগলো। কয়েকটি গাড়ি স্রেফ কিতাবেই ভরে গেলো। এবার সমস্যার ওপর সমস্যা হলো–গাড়ি টানার জন্য গাধা বা ঘোড়ার অভাব। প্রায় সবাই দেশ ত্যাগ করছে। কাজেই মাল-পত্র বহনের জন্য গাধা-ঘোড়ার প্রয়োজন সবার। তাই এর অভাব দারুণভাবে দেখা দেবে এতো সহজ কথা।

শেষে এমন অবস্থা হলো, অনেকগুলো কিতাবের গাড়ি গাধা-ঘোড়ার পরিবর্তে পরিবারের জওয়ান-কিশোররা টেনে নিয়ে চললো। মাঝে মাঝে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরাও

তাদের সাহায্য করতে লাগলো। কাফেলার গতি ছিল মন্থর। ফলে তারা পড়ে গেলো সবার পেছনে। এক জায়গায় শোনা গেল তাতারীরা এসে পড়েছে। কাফেলার গতি দ্রুত করা দরকার। কিন্তু একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। কিতাবের গাড়িগুলোর চাকা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। সেগুলো আর চলতে চায় না। গাড়ির চাকাগুলো ছিল বহু পুরাতন। এতদূর চলার মত ক্ষমতাও তাদের ছিল না। তবুও আল্লাহর মেহেরবাণীতে এতক্ষণ চলে আসছিল। কিন্তু এখন হাজার ধাক্কা দিয়ে ও শত টানাটানি করেও চাকাগুলো আর ঘুরতে চায় না। পরিবারের সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে শুরু করলো। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করলেন। গাড়ি আবার চলতে লাগলো। কাফেলা দ্রুত এগিয়ে চললো।

দামেশকে পৌঁছার পর দামেশকবাসীরা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। দামেশকের বিদগ্ধ সমাজ আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার ইলমী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল। আর শিহাবুদ্দীন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়ার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও দামেশকে কম ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই পিতা আবদুল হালীম জামে উমুবীতে দরস এবং দারুল হাদীস আসসিকরিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করলেন। কাজেই নতুন শহরের নতুন পরিবেশে তাইমিয়া পরিবার নিজেদেরকে মোটেই আগন্তুক মনে করলো না। শীঘ্রই তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিশোর ইবনে তাইমিয়া শীঘ্রই কুরআন মজীদের 'হিফয' সম্পন্ন করে হাদীস, ফিক্‌হ ও আরবী ভাষার চর্চায় মশগুল হলেন। এই সংগে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে শরীক হতে থাকলেন। ফলে বিদ্যাশিক্ষার সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের গতিও দ্রুত হলো।

ইমামের খান্দানের সবাই অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদার কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু তাদের তুলনায় ইমাম তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। শিশুকাল থেকে তাঁর অদ্ভুত স্মরণশক্তি শিক্ষকদের অবাক করে দিয়েছিল। দামেশকেও তাঁর স্মরণশক্তির চর্চা ছিল লোকের মুখে মুখে।

একবার হলবের (আলেপ্পো) একজন বিখ্যাত আলেম দামেশকে আসেন। তিনি এখানকার তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া নামক একটি কিশোরের অদ্ভুত স্মরণশক্তির চর্চা শুনলেন। এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য মাদ্রাসা যাবার পথে এক দরজীর দোকানে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পথে অনেক ছেলেকে আসতে দেখা গেলো। দরজী দেখিয়ে দিল, ঐ বড় তখতি বগলে ছেলেটি ইবনে তাইমিয়া। তিনি ছেলেটিকে ডাকলেন। তার তখতিতে তের চৌদ্দটি হাদীসের 'মতন' (মূল বর্ণনা) লিখে দিয়ে বললেন, পড়ো। কিশোর ইবনে তাইমিয়া একবার গভীর মনযোগের সাথে পড়লেন। তিনি তখতিটি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, মুখস্থ শুনিয়ে দাও। ইবনে তাইমিয়া গড়গড় করে বলে গেলেন। তখতি মুছে ফেলে এবার তিনি একগাদা সনদ

লিখে দিয়ে বললেন, পড়ো। পড়া হয়ে গেলে মুখস্থ বলতে বললেন। গড়গড় করে এবার সনদও বলে গেলেন। অবাক হয়ে গেলেন হলবের আলেম। বললেন, বড় হয়ে এ ছেলে অসাধ্য সাধন করবে। কারণ এ ছেলে যে যুগে জন্মেছে সে যুগে এ ধরনের স্মরণশক্তি কল্পনাই করা যায় না।

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চা

অষ্টম হিজরী শতকে ইমাম তাকীউদ্দিন আহমদ ইবনে তাইমিয়া ইসলামী পূনরুজ্জীবনের যে দায়িত্ব সম্পাদন করেন তার মূলে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং দীনি ইলমে অসাধারণ পারদর্শিতা। এ ব্যাপারে সমকালীন আলেম ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। এই অতুলনীয় জ্ঞান তিনি লাভ করেন শিক্ষা, অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে। নবী ও রসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করেন। এ জন্য তাঁদের দুনিয়ার কোনো গ্রন্থ ও শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হয়নি। কিন্তু অন্য সকল মানুষকেই শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে জ্ঞান লাভ করতে হয়। আল্লাহ প্রদত্ত স্মৃতিশক্তি ও মেধা জ্ঞানের ডালি পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে মাত্র।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া সাত বছর বয়সে শিক্ষায়তনে প্রবেশ করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তোলেন। কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ও উসুলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করার প্রতিও বিশেষ নজর দেন। তিনি দুশোর বেশি উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শেখেন। কুরআনের তাফসীরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সব চেয়ে বেশি। তিনি নিজেই বলেছেন, কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য তিনি ছোট-বড় একশোরও বেশি তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কুরআন মজীদ অধ্যয়ন এবং এর ওপর অত্যধিক চিন্তা-গবেষণার কারণে আল্লাহ ত'আলা কুরআনের গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাফসীর গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই তিনি নিজের জ্ঞান-স্পৃহাকে আবদ্ধ করে রাখতেন না বরং এই সংগে গ্রন্থ প্রণেতার কাছেও চলে যেতেন। তাঁর সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেও জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন।

কুরআন অধ্যয়ন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'কখনো কখনো একটি আয়াতের অন্তরনিহিত অর্থ অনুধাবন করার জন্য আমি একশোটি তাফসীরও অধ্যয়ন করেছি। তাফসীর অধ্যয়ন করার পর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, হে আল্লাহ, আমাকে এ আয়াতটির অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করো। আমি বলতাম, হে আদম ও ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে শিক্ষা দাও। আমি বিরান এলাকা ও মসজিদে চলে যেতাম এবং মাটিতে কপাল রেখে বলতাম, হে ইবরাহীমের জ্ঞানদাতা! আমাকে জ্ঞান দাও।

কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হর সাথে সাথে কালাম শাস্ত্রেও তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সে সময় কালাম শাস্ত্রে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের চর্চা ছিল সবচাইতে বেশি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর পরিবারবর্গ ছিলেন হাম্বলী মযহাবের অনুসারী। আর হাম্বলীদের সাথে আশ'আরীদের ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। আসলে প্রতিপক্ষের দর্শন ও যুক্তি পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই তিনি কালাম শাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি ইলমে কালামের ভেতরের দুর্বলতা, তাদের লেখকদের দুর্বল যুক্তি পদ্ধতি এবং এমনকি গ্রীক দার্শনিকদের গলদগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন। ইলমে কালাম গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পরেই তিনি এর যাবতীয় গলদের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেন এবং শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করে এমন কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন যার জবাব সমকালীন লেখক ও দার্শনিকদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি।'

মোটকথা, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইবনে তাইমিয়া তাঁর যুগে কুরআন ও সুন্নাতের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব এবং আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করার সাথে সাথে মানুষকে ইলম ও আমলের গোমরাহী থেকে বাঁচাবার জন্য এমন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, যা আসলে ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে প্রয়োজন ছিল। তাঁর সময় মানুষের চিন্তা ও জ্ঞান-রাজ্যে যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল তিনি পরিপূর্ণরূপে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোথাও জড়তা ও ভেজাল ছিল না। সবই ছিল স্বচ্ছ ও নিখাদ। কোন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হবার পর তাঁর কাছ থেকে সে সম্পর্কিত কোনো নতুন জ্ঞান নিয়েই ফিরে এসেছেন, সাধারণত এটাই দেখা গেছে। তাঁর জনৈক বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী আল্লামা কামালউদ্দীন যামালকানী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পারদর্শিতা সর্ম্পকে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন। 'কখনো দেখা যায়নি যে, তিনি কারোর সাথে বিতর্কে হেরে গেছেন। কোন বিষয়ে কারোর সাথে বিতর্কে নামার পর দেখা গেছে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞদেরকেও তিনি হার মানিয়েছেন।'

বাইশ বছর কাল পর্যন্ত জ্ঞান লাভের পর তিনি জ্ঞান বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাইশ বছর বয়সের সময় তার মহান পিতা শিহাবুদ্দীন আবদুল হালীম ইবনে তাইমিয়া (৬৮২ হিঃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন দামেশকের প্রধান দারুল হাদীস আসসিকারিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস। তাঁর মৃত্যুতে এ পদটি শূন্য হয়। পর বছর তার সুযোগ্য পুত্র ইমাম তাকীউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া এ পদটি পূরণ করেন। তিনি বাইশ বছর বয়সে হাদীসের প্রথম দরস দেন। এ দরসে দেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। যুবক আলেমের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। এর একমাস পরে জুমার দিন শহরের প্রধান মসজিদ জামে উমুবীতে তিনি পিতার শূন্যস্থানে কুরআনের তাফসীর করার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তাঁর জন্য

বিশেষভাবে মিম্বার তৈরি করা হয়। প্রতি সপ্তাহে তার তাফসীরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। কুরআনের তাফসীরে তিনি সমকালীন সব সমস্যা ও তার কুরআনিক সমাধানও বর্ণনা করতেন। এই সংগে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত তাকওয়া, ঈমানী বলিষ্ঠতা ও সৎকর্মশীলতা জনগণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় তাঁর সুনাম চতুরদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান

৬৯৩ হিজরীতে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় তাঁকে সর্বপ্রথম মাঠে-ময়দানে নেমে আসতে হয়। এ সময় আসসাফ নামক একজন ঈসায়ী সম্পর্কে লোকেরা সাক্ষী দেয় যে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অশোভন বাক্য উচ্চারণ করেছে। এ অন্যায় কাজ করার পর জনৈক আরবের কাছে সে আশ্রয় নিয়েছে। একথা জানার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও দারুল হাদীসের শায়খ যয়নুদ্দীন আল ফারকী গভর্ণর ইযযুদ্দীন আইউবের কাছে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে অপরাধীর শাস্তি দাবী করেন। গভর্ণর অপরধীকে ডেকে পাঠান। লোকেরা আসসাফের সাথে একজন আরবকে আসতে দেখে আরবটিকে গালিগালাজ করতে থাকে। আরবটি বলে এ ঈসায়ীটি তোমাদের চেয়ে ভালো। একথা শুনে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে ঢিল মারতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে বিরাট হাংগামার সৃষ্টি হয়। গভর্ণর এজন্য ইমাম ও তার সাথিকে দায়ী মনে করে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ঘটনার আকস্মিকতা ও নাটকীয় পট পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে ঈসায়ীটি ইসলাম গ্রহণ করে। গভর্ণর তার প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করেন, পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইমাম ও তার সাথিকে কারামুক্ত করে তাঁদের নিকট মাফ চান। ইমামের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।

স্বার্থবাদী মহলের বিরোধী জোট

সপ্তম হিজরী শতকের শেষের দিকে ইমাম তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া যে সংস্কারমূলক কার্য্যবলী শুরু করেন কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠতে থাকে। ইমাম মানুষকে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের কার্যক্রমের প্রতি আহ্বান জানান। অথচ এইসব কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মানুষকে তাদের নিজেদের মনগড়া চিন্তা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মের দিকে পরিচালিত করছিল। সাধারণ মানুষ ও ইলমী মহলে ইমামের জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। কায়েমী স্বার্থবাদীদের চোখে এটা কাঁটার মতো বিধঁছিল। ৬৯৮ হিজরীতে এই মহলের পক্ষ থেকে ইমামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিরোধিতা শুরু হয়। বিরোধীরা তাঁর চিন্তাধারার সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরও আক্রমণ চালায়।

ইবনে তাইমিয়ার পরিবার সিরিয়ায় মোটেই অপরিচিত ছিল না। ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, তাঁর পরিবার তিন চার পুরুষ

থেকে সিরিয়ার ইলমী মহলে সুপরিচিত ছিল। তাঁর পিতা সমগ্র সিরিয়ায় এবং বিশেষ করে দামেশকে নিজের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠীত করেছিলেন। ইমাম নিজেও শ্রেষ্ঠ ইলমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এরপরও বিরোধী পক্ষ তাঁর ইলমী যোগ্যতা, জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ওপর আক্রমণ চালায়। ইমাম 'আল আকীদাতুল হামুবিয়্যাতুল কুবরা' নামক একটি পুস্তিকা লিখে তাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেন। ৫০ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকায় তিনি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈগণের বাণী ও আমল থেকে সরাসরি যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করেন। গ্রীক, রোমীয় ও ভারতীয় দর্শন প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমগণের বিভ্রান্তির প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তাঁদের কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী চিন্তা ও বক্তব্যের যথাযথ পর্যালোচনা করেন। কঠোর ভাষায় তাদের শরীয়ত বিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করেন।

তাঁর এ পুস্তিকাটি বিরোধী মহলের চাপা আক্রোশকে যেন সজোরে উৎক্ষিপ্ত করলো। সত্যের এ অকুণ্ঠ প্রকাশ তারা বরদাশত করতে পারলো না। বিরোধী পক্ষগুলো একত্র হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। তারা দাবী করলো, হানাফী কাযী শায়খ জালালুদ্দীনের মজলিসে তাঁকে হাজির হতে হবে এবং নিজের রচনা সম্পর্কে সাফাই পেশ করতে হবে। ইবনে তাইমিয়া তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই বিবাদে শহরের গভর্ণর আমীর সাইফুদ্দীন ইমামের পক্ষাবলম্বন করে বিরোধী পক্ষকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাদের অনেকেই আত্মগোপন করলেন। জুমার দিন ইমাম যথানিয়মে জামে উমুবীতে তাফসীর খতম করে কাজী ইমামুদ্দীন শাফেয়ীর মজলিসে গেলেন।। শহরের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একটি দলও তাঁর সহযোগী হলো। তাঁরা সবাই 'আল আকীদাতুল হামুবীয়্যা' পুস্তিকাটি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে থাকেলন। ইমাম তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলেন। ইমামের যুক্তিপূর্ণ জবাবে সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। ইমাম বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন। ফলে বিরোধী পক্ষের সমস্ত জারিজুরি খতম হয়ে গেলো। বিরোধিতাও আপাতত বন্ধ হয়ে গেলো।

কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ায় তাদের মধ্যে খুব কমই আন্তরিকতা থাকে। খালেস নিয়তে একমাত্র দীনের স্বার্থে যারা কোন হকের বিরোধিতায় এগিয়ে আসে তারা এক পর্যায়ে তাদের ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু স্বার্থবাদী ও বলিষ্ঠ মহলের চোখে ঠুলী বাঁধা থাকে, তাদের মন ও মস্তিষ্ক থাকে পুকুরের পচা পাঁকে ডুবানো। সত্যকে বুঝবার ও গ্রহণ করার তওফীক আল্লাহ ত'আলা তাদের কোনো দিনই দেন না। এজন্য হাজার বার সত্য প্রকাশিত হলেও, দিনের আলোর মতো তা চারদিকের আঁধার সম্পূর্ণরূপে দূর করলেও স্বার্থবাদী মহল তা কোনদিন উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ইবনে তাইমিয়ার বিরোধিতা সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও ভেতরে ভেতরে তা আবার পুঞ্জিভূত হতে থাকে। কিন্তু ঠিক এ সময়ই সিরিয়ায় তাতারী ফিতনা মাথা চাড়া দেবার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো পক্ষ এগিয়ে আসার সুযোগ পায়নি।

অন্যায় দমনে দল গঠন

৭০২ হিজরীতে সিরিয়া তাতারী আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া আবার তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন। অধ্যাপনা, তাফসীর ও দরসের কাজ তিনি যথারীতি চালিয়ে যেতে থাকেন। শিরক, বিদআত ও জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। এ যুগে ইসায়ী ও ইহুদীদের সাথে একত্রে বসবাসের কারণে মুসলমানদের মধ্যে অনেক ইসলাম বিরোধী আকীদা ও শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। মুসলমানরা এমন অনেক কাজে লিপ্ত হয়, যা জাহেলীয়াতের স্মৃতিকে তাজা করে তোলে এবং কাফের ও মুশরিক কওমের কার্যাবলীর অনুরূপ বরং প্রকৃত পক্ষে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সঞ্জাত। দামেশকের নহরে ফুলুতের তীরে ছিল একটি বেদী। এ বেদীটি সম্পর্কে অদ্ভূত ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। জাহেল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের জন্য এটা ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানরা সেখানে গিয়ে মানত করতো। ৭০৪ হিজরীতে ইবনে তাইমিয়া একদল মজুর ও পাথর কাটা মিস্ত্রীদের নিয়ে সেখানে হাযির হন। তাদের সহায়তায় বেদীটি কেটে তার টুকরোগুলো নদীতে নিক্ষেপ করে তিনি শিরক ও বিদআতের এই কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করেন। এভাবে মুসলমানরা একটি বিরাট ফিতনা মুক্ত হয়।

রসূলুল্লাহর সঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কিত হাদীসটির ওপর তিনি পুরোপুরি আমল শুরু করে দেন। এ হাদসিটিতে বলা হয় ঃ তোমাদের কেউ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তা বদলে দাও। যে এভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না, বাকশক্তি প্রয়োগ করে তাকে এর বিরোধিতা ও সংস্কার সাধন করতে হবে। আর যে তাও পারবে না সে নিজের মনের মধ্যে এর প্রতি বিরোধিতা ও ঘৃণা পুষে রাখবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। এ হাদীস অনুযায়ী শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলেই তিনি নিজের শক্তি ও সামর্থ মোতাবিক তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন। তা সংশোধন করে শরীয়ত অনুযায়ী তাকে বিন্যস্ত করতে সচেষ্ট হতেন।

শাসক সমাজ নিজেদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন। জনগণের আমল আকীদার সংস্কার ও পরিচর্যা করার কোনো দায়িত্ব তারা অনুভব করতেন না। আলেমগণ অনেক সময় সুস্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে ইতস্তত করতেন। কাজেই ইবনে তাইমিয়া একাই এর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে থাকেন। এ জন্য তিনি নিজের ছাত্র ও সমর্থকদের একটি জামায়াত গড়ে তোলেন। এ জামায়াতটি সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকতো। তাঁর বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতো। এ জামায়াতটির সাহায্যে তিনি জনগণের দীনি জীবন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন।

এ সময় তাঁর কাছে আল মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনুর কাত্তান নামক এক বৃদ্ধকে আনা হয়। বৃদ্ধটি বিরাট সুফী দরবেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। পোশাক ছিল ফকীরদের নানা বর্ণের শততালি দেয়া আজানুলম্বিত আলখেল্লা। মাথায় ছিল সন্ন্যাসীদের দীর্ঘ জটা। হাতের নখগুলো ছিল কয়েক ইঞ্চি লম্বা। মোচ এত দীর্ঘ ছিল যে তাতে সমস্ত মুখ ঢেকে গিয়েছিল। কথায় কথায় গালি দিতো। নেশা ভাং তার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ইবনে তাইমিয়ার নির্দেশে তার আলখেল্লা কেটে টুকরো টুকেরো করে দেয়া হলো। মাথার চুল কমিয়ে গোঁফ ছেঁটে দেয়া হলো। নখ কেটে দিয়ে তাকে তওবা করানো হলো যেন আর কখনো নেশা না করে।

এভাবে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আরো বহু গোমরাহ লোকের সংস্কার সাধন করেন। তাদের পুনর্বার দীনের পথে আনেন।

দুটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

দুটি দার্শনিক মতবাদ মুসলিম সুফি ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে অষ্টম হিজরী শতকে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে এ দুটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম করতে হয়। এ মতবাদ দুটি হচ্ছে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' এবং 'হুলুল ও ইত্তেহাদ'। আমাদের এ উপমহাদেশের দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ দুটিকে বলা হয় 'অদ্বৈতবাদ' ও 'সর্বেশ্বরবাদ'। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ মতবাদ দু'টি প্রবল হয়ে ওঠে। মুজাদ্দিদে আলফেসানী হযরত সাইয়েদ আহমদ সরহিন্দকে এর বিরুদ্ধে এখানে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর (মৃত্যু ৬৩৮ হিজরী) ফুসুসুল হাকাম গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন, ইবনে আরাবী ও তাঁর অনুসারীদের মতে এ বিশ্বে একটি মাত্র সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। সৃষ্টির অস্তিত্বই হচ্ছে স্রষ্টার অস্তিত্ব। এ বিশ্ব জাহানে তারা সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে দুটো পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকার করেন না। তারা একজন যে অন্য জনের স্রষ্টা একথা মানতে তারা প্রস্তুত নন। বরং তাদের মতে স্রষ্টাই হচ্ছে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই হচ্ছে স্রষ্টা।...তাই তাদের মতে বনি ইসরাইলদের যারা বাছুর পূজা করেছিল তারা আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল। তাদের মতে ফেরাউনের 'আনা রব্বুকুমুল আলা'—আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ খোদা—এ দাবীটি যথার্থ ছিল। ইবনে আরাবী হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সমালোচনা করে বলেন, তার কাফের কওম মূর্তি পূজার মাধ্যমে আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল, আর তাঁর সময়ের তুফান ছিল আসলে মারেফাতে ইলাহীর তুফান। এ তুফানের মধ্যে তারা ডুবে গিয়েছিল।

ইবনে আরাবীর পরপরই এ দর্শনের আরো কয়েকজন বড় বড় প্রবক্তা দেখা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইবনে সাবঈন, সদরুদ্দীন কুনুবী, বিলয়ানী ও তিলমিসানী। এদের মধ্যে তিলমিসানী কেবল বক্তব্য রেখেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না,

তিনি বাস্তবেও এ দার্শনিক নীতি মেনে চলতেন। কাজেই তিনি ও তার অনুসারীরা মদ পান করতেন, সমস্ত হারাম কাজ করতেন। কারণ তাদের মতানুযায়ী অস্তিত্ব যখন একটি মাত্র সত্তায় বিরাজিত তখন হালাল হারামের পার্থক্য থাকবে কেন? তিলমিসানীকে বলা হয়, আপনাদের বক্তব্য কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জবাবে তিনি বলেন, 'কুরআন তো আসলে শিরকে পরিপূর্ণ। কারণ কুরআন রব ও আরদের মধ্যে পার্থক্য করে। তার বিপরীত পক্ষে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে আসল তওহীদ নিহিত।' তিনি এও বলেন যে তাদের বক্তব্য কাশফের মাধ্যমে প্রমাণিত।

ভারতীয় বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধ মহনির্বানবাদ প্রভাবিত এই ওয়াহদাতুল ওজুদ ও হুলুলী মতবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি এ প্রসংগে বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বেশ্বরবাদী মতবাদ (pantheism) এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের এ ধরনের যাবতীয় গোমরাহীর বিস্তারিত তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেন। অতঃপর ইবনে আরাবী ও তার শাগরিদবৃন্দের মতবাদের কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে চুলচেরা পর্যালোচনা করেন।

ইসলামের নামে প্রচলিত এসব ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা ইবনে তাইমিয়াকে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্ষুশূল পরিণত করে। একদল তথাকথিত তাত্ত্বিকও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। মিসরের তদানীন্তন শাসককে তারা ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। আর সে সময় সিরিয়া ও মিসর ছিল একই রাষ্ট্রভুক্ত। রাজধানী ছিল মিসরের কায়রোয়। সিরিয়া ছিল মিসরের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। সিরিয়ার ইলমী মহলে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। প্রাদেশিক সরকারও তাঁর মতামত ও কাজের কদর করতেন। সিরিয়ার মুসলিম জনগণের তিনি ছিলেন চোখের মণি। তাই অনেক সময় প্রকাশ্যে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী কাজে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে সরকারের নিশ্চেষ্টতা ও নির্বিকারত্বের ক্ষেত্রে তিনি নিজের শাগরিদবৃন্দ ও জনগণের বাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে আসতেন। শরীয়ত বিরোধী কাজ বলপূর্বক বন্ধ করে দিতেন।

মিসরের কারাগারে

এ ছিল সিরিয়ায় তাঁর অবস্থা। কিন্তু মিসরের জনগণের মধ্যে তাঁর এ ধরনের প্রভাব তখনো বিস্তৃত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁর সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিল না। কাজেই চক্রান্তকারীরা সহজেই এই সরকারকে প্রভাবিত করে। ৭০৫ হিজরীর কোন মাসে মিসর থেকে বিশেষ শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে কায়রোয় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ইমামের ছাত্র ও বন্ধুমহল প্রমাদ গনেন। গভর্ণর তাঁকে বাধা দেন। তিনি সুলতানের সাথে পত্র ও দূতের মাধ্যমে

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার এবং তাঁর ভুল ধারণা দূর করার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ইমাম কারোর অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাননি। সবার অপরিসীম ভীতি ও আশংকাকে পেছনে রেখে তিনি কায়রোর পথে রওয়ানা হন। ২২ রমযান জুমার দিন তিনি মিসরে পৌঁছেন। কেল্লার জামে মসজিদে নামাজ পড়ার পর আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়নি। সেখানেই জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। তাঁর চিন্তা-আকীদা ইসলাম বিরোধী। কাজেই জনতা তাঁর কোন কথাই শুনতে প্রস্তুত নয়। কাজী ইবনে মাখলুফ মালেকীর নির্দেশে তাঁকে কেল্লার বুরুজে কয়েকদিন আটক রাখার পর ঈদের রাতে মিসরের বিখ্যাত জুব্ (কুয়া) কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পরের বছর ৭০৬ হিজরীর ঈদের রাতে গভর্ণর এবং কয়েকজন কাযী ফকীহের পক্ষ থেকে ইমামকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলে। তাদের কেউ কেউ এজন্য ইমামকে তাঁর আকীদা থেকে তওবা করার শর্ত আরোপ করেন। ইবনে তাইমিয়া এতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান। এ ব্যাপারে ছ'বার তাঁকে ডাকা হয় সরাসরি এসে কথা বলার জন্য। কিন্তু তিনি এ ডাকে সাড়া দেননি। প্রতিবারই তিনি হযরত ইউসুফের ন্যায় বলেন ঃ

اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِى اِلَيْهِ -(يوسف.٣٣)

'তারা আমাকে যে দিকে ডাকছে তার চেয়ে এই কারাগার আমার কাছে অনেক প্রিয়।'

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম প্রতিষ্ঠা যেমন ইমামের লক্ষ ছিল না তেমনি অসৎ আলেমদের প্রভাব থেকে সরকারকে মুক্ত করাও তার ছিল একটি প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলমানদের চিন্তা, আকীদা, বিশ্বাস ও কর্মকে সকল প্রকার শিরকের আবীলতা মুক্ত করে প্রভাত সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল করে তোলা এবং আল্লাহর দীনকে সব রকমের জড়তা ও বিভ্রান্তি মুক্ত করে সজীব ও সচল করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তাই নিজের গায় কোন প্রকার কলংক কালিমা মেখে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করাকে তিনি দীনের গায় কলংক লেপন করার সমতুল্য বিবেচনা করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চরিত্রের এ বৈশিষ্ট আমাদের আজকের আলেম সমাজের জন্য যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাবে সন্দেহ নেই। দীনের ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় এজন্য তিনি নিজেও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা আরাম আয়েশ বিসর্জন দেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সয়ে যেতে প্রস্তুত হন কিন্তু দীনের ওপর কোনও প্রকার নির্যাতন বরদাশ্‌ত করতে মুহূর্তকালের জন্যও প্রস্তুত হননি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কারাগারের সাথি ছিলেন তাঁর সহোদর শায়খ শরফুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া। শায়খ শরফুদ্দিন 'মজমুআ ইলমীয়া' গ্রন্থে কারাগারের ঘটনাবলী

বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তা থেকে সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে ইমামের দৃঢ়তা, ধৈর্য ও অবিচল সংগ্রামের কথা জানা যায়।

মিসরের নায়েবে সালতানাতের পক্ষ থেকে একদিন জেলের দারোগা তাঁর কাছে আসেন। তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে ইমামের সাথে আলাপ করতে চান। ইমাম তাঁকে বলেন, কারাগারে তিনি দীর্ঘদিন আছেন অথচ তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ কি, তিনি কি অপরাধ করেছেন, তা তিনি বিন্দুমাত্রও জানেন না। কাজেই এ ব্যাপারে কোন আলাপ করতে হলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অন্তত চারজন দায়িত্বশীল জ্ঞানী-গুণী লোকের একটি প্রতিনিধিদল আসতে হবে। তাদের সামনে তিনি নিজের বক্তব্য রাখবেন। তাহলে সেখানে তাঁর বক্তব্য বিকৃত আকারে সুলতানের কাছে পৌছবার সম্ভাবনা কম থাকবে।

এ কথায় দারোগা চলে গেলেন। কিন্তু তারপরও কোন প্রতিনিধি দল এলো না। দারোগা আবার এলেন। এবার সংগে করে আনলেন আলাউদ্দীন তাবরাগী নামক এক ব্যক্তিকে। আলাউদ্দীন তাবরাগী তাঁর কাছ থেকে ভুলের স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলেন। আলাউদ্দীন নিজের পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি লিখে এনেছিলেন। ইমামকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তাতে সই করার জন্য। এতে ইমামের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ ছিল। তিনি যা বলেননি এবং যা বিশ্বাস করেন না এমনই অনেক কথা এতে ছিল। ইমাম এর জবাবে বলেন, 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবার কোন অধিকার আমার নেই। এ বিষয়টি আল্লাহ, রসূল ও সমগ্র মুসলিম সমাজের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহর দীনের মধ্যে পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। অথবা আপনাদের বা অন্য কারোর কারণে আমি আল্লাহর দীন থেকে সরে যেতে পারি না। আল্লাহর দীনের ওপর কোনো প্রকার মিথ্যা আরোপ করার মতো দুষ্কর্ম আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়।'

সরকারী প্রতিনিধির বেশি পীড়াপীড়ি দেখে ইমাম নিজেকে আরো শক্ত করে নিলেন। তিনি প্রতিনিধিকে সাবধান করে দিলেন যে, এভাবে পীড়াপীড়ি করে কোন লাভ নেই। বরং এই বাজে কাজ ছেড়ে নিজের কোনো দরকারী কাজ থাকলে তা করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, আমি কারাগার থেকে মুক্তিলাভের জন্য কারোর কাছে আবেদন জানাইনি। এ সময় ওপরের দরজা বন্ধ ছিল। ইমাম ওপরের দরজা খুলে দিতে বললেন। তিনি চলে যেতে প্রস্তুত হলেন। এরপরও তিনি সরকারী প্রতিনিধিকে বললেন, আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কোনো কথা বলিনি। আমার কাছে ফতোয়া এসেছে, লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, তার জবাবে আমি বলেছি। দীন ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্য গোপন করার কোনো অধিকার কি আমার আছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ اَلْزَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اِلْمزَمٍ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তিকে দীনের এমন কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়—যে সম্পর্কে তার জানা আছে কিন্তু সে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' কাজেই আপনাদের কথায় কি আমি সত্য সন্ধানীর প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেবো না?

তাবরাগী চলে যাবার পর দারোগা আবার এলেন। এবার তিনি ইমামকে বললেন যে, নায়েবে সালতানাত আপনার আকীদার ব্যাপারে লিখিত আকারে জানতে চান। ইমামকে তিনি নিজের আকীদার বিষয়গুলো একটা কাগজে লিখে দিতে বলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখিত আকারে কিছু দিতে অস্বীকার করে বলেন, এখন আমি যদি কিছু লিখে দেই তাহলে লোকেরা বলবে, ইবনে তাইমিয়া তার সাবেক আকীদা বদলে ফেলেছে। ইমাম বলেন, 'এভাবে দামেশকেও আমার কাছে নিজের আকীদার ব্যাপারে লিখিতভাবে চাওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও আমি তা দেইনি। সেখানে আমি নিজের লিখিত গ্রন্থগুলো পেশ করি। আমার চিন্তা ও বক্তব্য সেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে। আমার এসব বক্তব্য ও গ্রন্থ সিরিয়ার গভর্ণর ডাকযোগে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি জানি সেগুলো সুলতানের কাছে আছে। আর আকীদা নিজের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করার মত কোন জিনিস নয়। প্রতিদিন কি আমি এ ধরনের এক একটা নতুন নতুন আকীদা তৈরি করতে থাকবো? আমার আকীদা তাই যা আমি আগে ঘোষণা করেছি, যা আমার রচনা ও গ্রন্থাবলীতে রয়েছে। সেগুলো আপনাদের কাছে আছে। সেগুলো দেখে নিন।'

দারোগা এবারও ফিরে গিয়ে আবার আসেন। এবার তিনি ইমামকে বলেন, 'অন্তত লিখিত আকারে কিছু দিন। এই যেমন ধরুন ক্ষমাপত্র অথবা কারোর সাথে আপনি বিরোধ করবেন না।' 'ইমাম বললেন, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে, কাউকে কষ্ট দেয়া, কারোর ওপর প্রতিশোধ নেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। যারা আমার ওপর জুলুম-অত্যাচার করে, আমার সাথে অন্যায় ও অসদ্ব্যবহার করেছে, আমি তাদের জন্য ক্ষমাপত্র লিখে দিতে চাই। কিন্তু আসলে এসব লিখিত আকারে দেবার কোনো রীতি নেই। তাই আমি মুখে এসব কথা বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করি।'

দারোগার সাথে আলোচনা শেষ করে ইমাম কারাগারের অভ্যন্তরে চলে আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন কয়েদীরা নিজেদের মন ভুলাবার জন্য নানারকম আজে বাজে খেলা-ধূলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। কেউ তাস, কেউ দাবায় মশগুল। নামাজের দিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই। নামাজ কাযা হয়ে যাচ্ছে খেলার ঝোঁকে। ইমাম এতে আপত্তি জানান। তিনি কয়েদীদেরকে নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরেন। তাদেরকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজেদের পাপ কাজগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেন এবং এসবের জন্য তাদেরকে আল্লাহর দরবারে নিরন্তর ক্ষমা প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে জেলখানার কয়েদীদের মাঝে দীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে

গেলো যে, সমগ্র জেলখানাটিই একটি মাদ্রাসায় পরিণত হলো। কারাগারের কর্মচারী ও কয়েদীরা ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেললেন। কারাগারের ইলমী ও সুস্থ পরিবেশ কয়েদীদের চোখে মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দিল। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, এ সময় অনেক কয়েদী তাদের কারামুক্তির ঘোষণা শুনার পরও জেলখানা ছেড়ে যেতে চাইল না। তারা সাইখুল ইসলামের খেদমতে আরো কিছুদিন থেকে যাবার আর্জি পেশ করলো।

চারমাস পর ৭০৭ হিজরীর সফর মাসে আবার তাঁর মুক্তির প্রচেষ্টা চললো। কাযী বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ কারাগারে ইমামের সাথে সাক্ষাত করেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পরও তিনি সরকারী শর্তে ইমামকে কারাগার থেকে মুক্তিলাভে সম্মত করতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে রবিউল আউয়াল মাসে আমীর হুসামুদ্দীন কসম দিয়ে নিজ দায়িত্বে ইমামকে নায়েবে সালতানাতের কাছে আনেন। আমীর হুসামুদ্দীন তাঁকে নিজের সাথে দামেশকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু নায়েবে সালতানাত তাঁকে অনুরোধ করেন মিসরে কিছুদিন থেকে যাবার জন্য। মিসরের লোকেরা তাঁর ইলম ও তাকওয়া সম্পর্কে যাতে সঠিকভাবে অবহিত হতে পারে এবং তার কল্যাণ ধারায় নিজেদের জীবন ধন্য করতে পারে এজন্য তিনি পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবার দায়িত্ব নেন।

কারামুক্তির পর

কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি মিসরের সাধারণ মানুষের সাথে বেশি করে মেলামেশা করতে লাগলেন। সুলতান তাঁর কাছে মূল্যবান হাদিয়া পাঠালেন এবং রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য তাকে খেতাব দান করলেন। কিন্তু তিনি এর কোনটি গ্রহণ করলেন না। তিনি দেখলেন সরকার ও প্রশাসনের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে বিরোধে লিপ্ত হতে হচ্ছে। তাদের কোন প্রকার অনুগ্রহের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা কোনক্রমেই উচিত নয়। তাই যথাসম্ভব প্রশাসন যন্ত্রের প্রভাব থেকেও নিজেকে আলাদা রাখলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর বিরুদ্ধে এতদিন যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাদের সবাইকে মাফ করে দিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন, কারোর বিরুদ্ধে তাঁর কোনো নালিশ নেই।

এসব দিনে মিসরে অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রভাব বেড়ে চলছিল। বিশেষ করে মিসরের প্রখ্যাত সুফী কবি আবুল ফারেয (মৃত্যু ৬৩২ হিজরী) ছিলেন এ মতবাদের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তার প্রচেষ্টায় কাব্যের সুষমামণ্ডিত হয়ে এ মতবাদটি সাধারণ মানুষ ও সুফী সমাজের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করছিল। মিসরের বিপুল সংখ্যক সুফী ও মাশায়েখ এ মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া মিসরের বুকে বসে প্রকাশ্যে এ মতবাদের বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী দর্শনের

চিন্তাধারাকে কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং পরবর্তীকালের সুফীদের অভিনব উদ্ভাবন ও দীনের মধ্যে অবিমৃশ্যকারিতারূপে চিহ্নিত করলেন। হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী র. ও শায়খ আদী ইবনে মুসাফির উমূবীর র. ন্যায় সুফীদের আকীদা ও কর্মকাণ্ডের তিনি প্রশংসা করলেন, কিন্তু তার নিজের সমকালীন সুফী ও মাশায়েখদের কঠোর সমালোচনা করতে থাকলেন। তাঁর মতে এসব সুফী ও মাশায়েখ গ্রীক, মিসরীয় ও ভারতীয় জড়বাদী ও তওহীদ বিরোধী দর্শন দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত।

এইসব বিভ্রান্ত মাশায়েখ ও সুফীদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার র. বলিষ্ঠ ও ব্যাপক সমালোচনায় সুফী মহলে বিপুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। মিসরের মশহুর শায়খে তরীকত ইবনে আতাউল্লাহই ইস্কানদারী সুফীদের প্রতিনিধি হিসেবে দুর্গে গিয়ে সুলতানের কাছে ইমামের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সুলতান দারুল আদলে সভার আয়োজন করে এ অভিযোগটির যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দেন। ইবনে তাইমিয়াকে এ সভায় আহ্বান করা হয়। তাঁর বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, যুক্তিবাদিতা, কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং যাদুকরী বক্তৃতা শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে। সভাস্থলের সবার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা স্থগিত হয়।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেলেও বিরোধী মহলের অপপ্রচার ও চাপা আক্রোশ মাঝে মধ্যে ফুঁসে উঠতে থাকে। বিরোধীরা এখন তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ভিন্নপথ আবলম্বন করে। তারা অভিযোগ আনে, ইমাম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কারোর দোহাই দেয়া জায়েয নয়। একমাত্র আল্লাহর কাছেই যা কিছু চাওয়ার চাইতে হবে। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও ফরিয়াদ জানানো যাবে না। এসব অপপ্রচারের জবাবে কোনো কোনো আলেম মন্তব্য করেন, এ ধরনের চিন্তাধারা তেমন কোনো দোষের নয়, তবে এটা এক ধরনের বে-আদবী বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ ধরনের চিন্তাধারাকে তারা কুফরীর পর্যায়ে ফেলতে প্রস্তুত হয়নি। ফলে এ যাত্রায়ও ইমাম রেহাই পেলেন।

কিন্তু এর পরও বিরোধীদের মুখ বন্ধ হলো না। তারা প্রতিদিন নতুন নতুন অপপ্রচারে মেতে ওঠে। দিনের পর দিন এইভাবে এক নাগাড়ে অভিযোগ, নালিশ ও দোষারোপে অতিষ্ঠ হয়ে সরকার ইমামের কাছে তিনটি প্রস্তাব রাখে। তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি তাঁকে বেছে নিতে হবে। তিনি চাইলে দামেশকে চলে যেতে পারেন। অথবা ইসকানদারীয়ায় গিয়ে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু এ দু'জায়গায় থাকতে হলে তাঁকে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। অন্যথায় তৃতীয় প্রস্তাবটি হচ্ছে কারাগারে অবস্থান করা। ইমাম করাগারে অবস্থান করাকেই অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু তার ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ দামেশকে ফিরে যাবার জন্য চাপ দিতে থাকে। তাদের

পীড়াপীড়িতে তিনি অবশেষে দামেশকে যাবার প্রস্তুতি শুরু করেন। ৭০৭ হিজরীর ৮ শওয়াল তিনি দলবল নিয়ে শহর থেকে বের হয়েও পড়েন! কিন্তু সেদিনই আবার তাঁকে পথ থেকে মিসরে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে বলা হয়, সরকার তাঁকে কারাগারে রাখাই ভালো মনে করেন। কিন্তু কাযী ও আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে এবার কোনো সুস্পষ্ট অভিযোগ আনতে পারলেন না। তাই তারা সংশয়ের দোলায় দুলছিলেন। উলামা ও কাযীদের মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করে ইমাম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় কারাগারে যাবেন। কিন্তু কাযীরা তাঁকে কারাগারে পাঠাতে চাচ্ছিলেন না। ফলে তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হলো। ছাত্র ও আলেমগণ তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারতেন। তাঁর সাথে জ্ঞানচর্চা ও গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল নিয়ে আলোচনা চলতো। বিশেষ ব্যাপারে তার কাছ থেকে ফতোয়াও নেয়া হতো। কিছুদিন পরে উলামা ও ফকীহদের এক সম্মেলনে ইমামকে মুক্তি দেবার জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার তাঁকে মুক্তি দান করেন। জনসাধারণ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। তাঁর জনপ্রিয়তা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। জনগণের মধ্যে তাঁর পরিচয় বাড়ার সাথে সাথে প্রভাব ও বেড়ে চলতে থাকে। আর তাঁর প্রভাব বাড়ার অর্থই হচ্ছে জনগণের মধ্য থেকে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী আকীদা বিশ্বাস, বিদআত ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মুসলিম জনগণ কুরআন ও সুন্নাহর পথে যথাযথভাবে এগিয়ে যেতে পারবে। এভাবে বিরুদ্ধ পরিবেশে ইমাম তাঁর কাজ সঠিকভাবে করে যেতে থাকেন।

এ সময় রাজনৈতিক অবস্থার আকস্মিক গতি পরিবর্তনে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পথে আরো বেশি বাধার সৃষ্টি হয়। তাঁর বিরোধী পক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠে। নাসিরুদ্দিন কালাউন এ সময় ছিলেন মিসর ও সিরিয়ার সুলতান। তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ইলম, পাণ্ডিত্য, তাকওয়া, আন্তরিকতা ও সাহসিকতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। ইমামই তাকে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন। এ সময় তিনি স্বচক্ষে ইমামের সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কাজেই মোটামুটি তিনি ইমামের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু ৭০৮ হিজরীতে বিভিন্ন কারণে তিনি রাষ্ট্র শাসন থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে রুকনুদ্দীন বাইবারস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুলতান বাইবারসের আধ্যাত্মিক গুরু ও দীনী ব্যাপারে পরামর্শদাতা ছিলেন শায়খ নাসরুল মম্বাজী। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন এই শায়খের আকিদা, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের প্রধান সমালোচক। আবার অন্যদিকে ইমামকে সাবেক সুলতানের প্রিয়পাত্র মনে করাও হতো। কাজেই বিরোধীরা এবার তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ পায়।

এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তারা মুহূর্তও দ্বিধা করেনি। কাজেই বাইবারস ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথেই ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ইসকানদারিয়ায় পাঠিয়ে সেখানে নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ৭০৯ হিজরীর সফর মাসের শেষের

দিকে তাঁকে ইসকানদারিয়ায় পাঠানো হয়। ইসকানদারিয়া ছিল সুফী ও সুফীবাদের প্রাচীন কেন্দ্র। শোনা যায়, সরকারের এও উদ্দেশ্য ছিল যে, সুফীদের এই প্রাচীন কেন্দ্রে কোনো গোঁড়া ও তেজস্বী সুফী তাঁর দফারফা করে দেবেন এবং সরকার তার রক্তের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু সরকারের এ আশা পূর্ণ হয়নি।

ইসকানদারীয়ায় ইমামের তৎপরতা

ভূমধ্যসাগরের তীরে মিসরের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বন্দর ও এককালের রাজধানী নগরী ইসকানদারীয়া। অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রবক্তা সুফীদের সংখ্যা এ শহরে ছিল সবচেয়ে বেশি। সুফীদের এ গোমরাহ দর্শনের প্রভাব জনগণের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ শহরে ছিল এ দর্শনের বড় বড় প্রচারক। তারা কেবল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তার মধ্যে শিরক ও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, মানুষের চরিত্র ও কর্মকেও ইসলাম বিরোধী খাতে প্রবাহিত করেছিল। ফলে ইসলামী শরীয়ত ও অনুশাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা ও অবজ্ঞা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

ইসকানদারীয়ায় পৌঁছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সুফী ও জনগণের চিন্তা ও কর্মের এই গলদ দূর করার সংকল্প করেন। প্রথমে কুরআন ও হাদীসের দরসের মাধ্যমে নিজের একটি ছাত্র ও সমর্থক গ্রুপ তৈরি করেন। ধীরে ধীরে তাঁর এ গ্রুপের কলেবর বেড়ে যেতে থাকে। সাধারণ মানুষ দলে দলে তার কাছে আসতে থাকে। ইমাম মহা উৎসাহে জনগণের চিন্তার পরিশুদ্ধির কাজে নেমে পড়েন। এই সঙ্গে শরীয়তের অনুশাসন অনুযায়ী তাদের কর্ম ও চরিত্র গড়ে তুলতে থাকেন। তিনি মাত্র আট মাস এ শহরে অবস্থান করেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিরোধী মহলের সমস্ত শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত প্রভাবশালী শ্রেণীর বিরাট অংশ ইসলাম বিরোধী দর্শণের অনুসারী সুফীদের খপ্পর থেকে বের হয়ে আসে। ইমাম তাদেরকে তওবা করান। একজন প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় সুফীও তাঁর হাতে তওবা করেন।

ইসকানদারীয়ায় ইমামের এই সাফল্য সম্পর্কে তাঁর সাথে অবস্থানকারী তাঁর ছোট ভাই শরফুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া দামেস্কবাসীদের নামে লিখিত এক পত্রে লিখেছেন ঃ 'ইসকানদারীয়াবাসীরা ভাই সাহেবের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে। তিনি সব সময় কুরআন ও সুন্নাতের প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবার মনে শায়খের প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদা স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করেছে। শাসক, বিচারক, ফকীহ, মুফতী, মাশায়েখ ও মুজাহিদ নির্বিশেষে প্রায় সব গোষ্ঠীই তাঁর ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয়েছে। একমাত্র মুর্খ জাহেল লোকেরাই তাঁর থেকে সরে আছে।'

এদিকে সুলতান রুকনুদ্দীনের পতন ঘনিয়ে এসেছিল। স্বেচ্ছা নির্বাসিত সাবেক সুলতান নাসিরুদ্দীন কালাউন মাত্র এগার মাস পরে আবার রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ

হন। রুকনুদ্দীন রাজকার্যে ইস্তেফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন। এই সংগে তাঁর পরামর্শদাতা শায়খ নাসরুল মুমবাজীরও পতন হয়। ফলে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাগ্যাকাশে ঘনীভূত দুর্যোগের মেঘ কাটতে শুরু করে। সুলতান নাসিরুদ্দীন কালাউন মিসরে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করেন। সংগে সংগেই লোক পাঠিয়ে ইমামকে ইসকানদারীয়া থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। ইমামের ইসকানদারীয়া ত্যাগের খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা দলে দলে এসে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে থাকে। হাজার হাজার ছাত্র ও ভক্তের অশ্রু সজল দৃষ্টির সামনে ইমামের কাফেলা কায়রোর দিকে রওয়ানা হয়। কায়রোয় পৌঁছার পর সুলতান ও উৎফুল্ল নগরবাসীরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান।

রাজ দরবারে সত্য কথন

ইতিপূর্বে মিসর ও সিরিয়ার আলেমগণ অমুসলিম যিম্মীদের পোশাকের ব্যাপারে একটা বিশেষ বিধান জারী করেছিলেন। বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলোয় ইউরোপ থেকে আগত খৃস্টান পরিবার বসবাস করে আসছিল। তাদের অনেকে ইউরোপের খৃস্টান দেশগুলোর পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এমনকি একবার কায়রোয় একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়। তাতে বহু মুসলমান নিহত ও মুসলমানদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পরে তদন্ত করে জানা যায়, একদল খৃস্টান সুপরিকল্পিতভাবে এ ধ্বংসযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছিল। এরপর থেকে যিম্মীরা যাতে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের ক্ষতিসাধন করতে না পারে সেজন্য তাদের পোশাকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার প্রশ্ন ওঠে। উলামায়ে কেরামের ফতোয়া অনুযায়ী সরকার যিম্মীদেরকে নীল পাগড়ী ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। এতোদিন যিম্মীরা এ নির্দেশ মেনে আসছিল। আজ দরবারে প্রধানমন্ত্রী সুলতানের নিকট যিম্মীদের জন্য একটা নতুন আইন পাশ করার প্রস্তাব আনলেন।

দরবারে ইবনে তাইমিয়াও সুলতানের পাশে বসেছিলেন। মিসরের শ্রেষ্ঠ কাযী, আলেম ও ফকীহগণও এখানে হাজির ছিলেন। আসলে ইবনে তাইমিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দরবার আহূত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তার প্রস্তাবে এখন থেকে মুসলমানদের ন্যায় যিম্মীদেরও সাদা পাগড়ী ব্যবহারের কথা বলেন এবং এই সঙ্গে এ কথাও বলেন যে এর বিনিময়ে যিম্মীরা সরকারকে প্রতি বছর ৭ লাখ দীনার কর প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যিম্মিরা বর্তমানে যে সমস্ত কর দিয়ে আসছে সেগুলো আগের মতোই দিয়ে আসবে।

প্রস্তাব পাঠ করার পর সুলতান উলামা ও ফকীহদের দিকে তাকালেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানতে চাইলেন। আল্লামা যামালকানীর মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও অন্যান্য কাযীগণ চুপ করে রইলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া দরবারের এ অবস্থা

দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে তাঁকে জেরা করতে লাগলেন। সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন। সুলতান তাঁকে ক্রোধান্বিত না হবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সুলতানের অনুরোধের পরোয়া করলেন না। তাঁর অতিরিক্ত সাহস দেখে উপস্থিত আলেমগণ আতংকিত হয়ে উঠলেন। কি জানি এখনি দরবারে কী দুর্ঘটনা ঘটে যায়!

ইমাম প্রধানমন্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে এবার সুলতানকে সম্বোধন করে বললেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকে দরবারের কার্যক্রম-এর সূচনা করা হলো এমন একটা বিষয়ের সাহায্যে যা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য ধ্বংসকর। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ সাময়িক লাভের খাতিরে আপনি যিম্মীদের স্বার্থোদ্ধারে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথচ এতে ইসলাম ও আহলে ইসলামদের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। একবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ আপনার ওপর কত বড় ইহ্সান করেছেন। কিছুদিন আগে আপনি রাজ্য হারিয়েছিলেন। আপনার সম্মান প্রতিপত্তি সব ভূলণ্ঠিত হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে আবার সব ফিরে পেয়েছেন। আল্লাহ্ আপনার দুশমনকে লাঞ্ছিত করেছেন। বিরোধী পক্ষের ওপর আপনি বিজয় লাভ করেছেন। এখন আপনাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

সুলতান ইমামের সত্য কথনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন। ফলে যিম্মীরা আগের মতোই নীল পাগড়ী পরে বাইরে চলাফেরা করতে থাকলো।

শত্রুদের ক্ষমা করে দিলেন

ইমাম তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া সত্যের খাতিরে কখনো রাজদণ্ডের ভ্রুকুটির পরোয়া করেননি। সত্যের তিনি ছিলেন উলংগ প্রকাশ। 'আফযালুল জিহাদে কালেমাতুল হাক্কে ইনদা সুলতানিল জায়েরে'–জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ–রসূলের এ বাণীটিকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন। তার সাতষট্টি বছরের জীবনে তিনি কোনদিন অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। যেটাকে তিনি সত্য জেনেছেন সেটাকে সমুন্নত রাখার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনপাত করেছেন। এ জন্য কেউ তাঁর সংগে আছে কিনা বা কে তাঁর সংগ দিল আর কে সংগ দিল না সেদিকে তিনি ফিরেও তাকাতেন না। সারা জীবন সত্য ও ন্যায়ের জন্য প্রায় তাকে একাকীই লড়াই করতে হয়েছে।

ইস্কানদারীয়া থেকে ফেরার পর তেমনি একটি ঘটনা ঘটে গেলো সুলতানের দরবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। ইতিপূর্বেই এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। সুলতান নাসিরুদ্দীন কালাউন নৈতিক দিক দিয়ে সেদিন এমন এক পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন যার ফলে ইমামের সত্যের দুরন্ত প্রকাশকে মেনে নিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। নয়তো রাষ্ট্র

ব্যবস্থা তখন এমন পর্যায়ে ছিল না যা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন সিদ্ধান্তকে সহজে মেনে নিতে পারে। কিন্তু ইমামের সৎ সাহসের কারণে সেদিন তা সম্ভব হয়েছিল। সেদিন দেশের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, চার মযহাবের শ্রেষ্ঠ কাযীগণ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউ মুখ খোলেননি। যেখানে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা নিরব ছিলেন। শুধু তাই নয় এই আলেমগণের একটি বিরাট অংশ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তাঁকে কায়রো থেকে দেশান্তর করে ইসকানদারীয়ায় অন্তরীণ করার ষড়যন্ত্রে তারা শরীক ছিলেন। ইতিপূর্বে সুলতান নাসিরুদ্দীনের ক্ষমতাচ্যুতির পেছনেও ছিল তাদের চক্রান্ত। সুলতান এ কথা ভুলতে পারছিলেন না। তিনি আলেম ও কাযীগণের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

সুলতান এই গাদ্দার কাযী ও আলেমদের হত্যা করার বৈধতা লাভের জন্য ইমামের কাছ থেকে ফতোয়া সংগ্রহ করতে চাইলেন। সুলতান বললেন এরা পলাতক সাবেক সুলতানের পক্ষে এবং আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিল। তিনি এ ফতোয়া বের করে ইমামকে দেখালেন। এই সংগে একথাও বললেন, এরাই আপনার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে এবং চক্রান্ত জাল বিস্তার করে আপনাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। ইমামকে উত্তেজিত করাই ছিল সুলতানের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইমাম তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই কাযী ও উলামায়ে কেরামের নানা প্রসংগ তুলে তাদের প্রশংসা করতে থাকলেন। তিনি সুলতানের প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করলেন। তিনি সুলতানকে বুঝাতে থাকলেন যে, দেশের এই শ্রেষ্ঠ আলেমদের হত্যা করার পর আপনি এদের কোন বিকল্প আনতে পারবেন না, তখন দেশ ও জাতি অত্যন্ত মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হবে।

'তারা আপনাকে হত্যা করার জন্য বারবার ষড়যন্ত্র করছে। তারা আপনাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে।' সুলতান ইমামকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেন।

'আমার ব্যাপারে আমি এতটুকু বলতে পারি, যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তাদেরকে আমি মাফ করে দিয়েছি। আর যারা আল্লাহ ও রসূলের নিকট গুণাহ করেছে তাদের কার্যকলাপের প্রতিশোধ নেবার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। আমার নিজের জন্য আমি কখনো প্রতিশোধ নিই না।' ইমাম দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন।

এভাবে ইমাম বারবার সুলতানকে বুঝতে থাকলেন। শেষে সুলতানকে নিরস্ত হতে হলো। উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে সুলতান নিজের ক্রোধ দমন করলেন। এ যাত্রায় মিসর এক বিরাট রক্তপাত থেকে বেঁচে গেলো।

মিসরে মালেকী মযহাবের সবচেয়ে বড় কাযী ইবনে মাখলুফের একটি বিবৃতি ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর উদ্ধৃত করেছেন। কাযী সাহেব বলেন ঃ 'ইবনে তাইমিয়ার মতো এত বড় উদার হৃদয় ব্যক্তি আমি আর ইতিপূর্বে দেখিনি। আমরা তার বিরুদ্ধে

সরকারকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাদের কিছু করার ক্ষমতা অর্জন করলেন তখন আমাদের মাফ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, বরং সুলতানের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে সাফাই গাইলেন।'

সুলতানের দরবার থেকে ফিরে এসে ইমাম আবার তাঁর পুরাতন কাজে ব্যাপৃত হলেন। অধ্যাপনা, বক্তৃতা এবং ফতোয়া দান ও গ্রন্থ রচনা–কায়রোয় এটিই ছিল তাঁর প্রারম্ভিক কাজ। দামেশকের ন্যায় এখানেও তাঁর বিরাট ছাত্র ও সমর্থক গ্রুপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ইমামের আগমনের খবরে তারা আবার তাঁর চারদিকে জমা হয়ে গেলো। এমন কি বিরোধী ও চক্রান্তকারী গোষ্ঠীর বহু লোকও তাঁর কাছে এসে মাফ চাইতে লাগলো। ইমাম সবাইকে বলে দিলেন, আমার পক্ষ থেকে আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। কারোর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কিন্তু সবাই সন্তুষ্ট হতে পারে, আল্লাহর দুশমনরা কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। ইমামের একদল কট্টর বিরাধী সুলতানের কাছে ও দেশের বরেণ্য আলেম উলামার কাছে ইমামের মর্যাদা বৃদ্ধিতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। তারা ইমামকে অপদস্থ করার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করতে লাগলো। দামেশকের জনগণের মধ্যে ইমামের যে মর্যাদা ছিল কায়রোয় এখনো ইমাম সে মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হননি। কায়রোর জনগণের মধ্যে এখনো ইমাম ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে পারেনি। কাজেই এখানকার মুসলিম জনতাকে ঈমান, আকায়েদ ও মযহাবের প্রশ্ন তুলে ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা কেনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। বিরোধীরা এ অস্ত্র নিক্ষেপ করলো। ৭১১ হিজরী ৪ রজব কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর আক্রমণ চালালো। দুর্বৃত্তরা তাঁকে আহত করলো। হোসাইনিয়া মহল্লার লোকেরা সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু ইমাম তাদের নিবৃত্ত করলেন।

ইমাম উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ প্রথমত তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে আমার হক। আমি সর্বসমক্ষে আমার এ হক প্রত্যাহার করলাম। তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। দ্বিতীয়ত এটা তোমাদের হক হতে পারে। আর এ ব্যাপারে যদি তোমরা আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চাও এবং আমার কথা মানতে প্রস্তুত না হও তাহলে অবশ্যই তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো। আমার কিছু বলার নেই। তৃতীয়ত এটা হচ্ছে আল্লাহর হক। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর হক আদায় করে নেবেন। এ সময় আসরের নামাযের আযান হয়ে গেলো। ইমাম মহল্লার মসজিদ জামে হোসাইনীতে যাবার জন্য বের হয়ে পড়লেন। লোকেরা বাধা দিল। কিন্তু তিনি কোনো বাধা শুনলেন না। ফলে একটি বিরাট দলও তাঁর সংগ নিল। তিনি সসম্মানে মসজিদ থেকে নামায পড়ে এলেন।

ইমামের সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায়

সাতশো বারো হিজরীতে আবার তাতারীদের আক্রমণের খবর শোনা গেলো। তারা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে এগিয়ে আসছে। তাতারী আক্রমণ প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতান নাসিরুদ্দীন কালাউন। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়ার পথে রওয়ানা হলেন জিহাদের নিয়তে। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও হলেন সেনাবাহিনীর সহযোগী। কিন্তু সিরিয়ায় পৌঁছে তারা শুনলেন তাতারীরা ফিরে গেছে। সেনাবাহিনী ফিরে গেলো মিসরে। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া দামেশকে থেকে গেলেন।

তালাকের ঝগড়া

দীর্ঘ সাত বছর পর ইমাম দামেশকে ফিরে এসেছিলেন। দামেশকবাসীরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। হাজার হাজার লোক নগরীর বাইরে এসে তাঁকে স্বাগত জানালো। বিপুল সংখ্যক মহিলাও এ অভ্যর্থনায় অংশ নিয়েছিল। জিহাদে অংশ গ্রহণের সুযোগ না পেয়ে ইমাম বাইতুল মাকদিস যিয়ারতের নিয়ত করলেন। বায়তুল মাকদিসে কিছুদিন অবস্থান করে সেখান থেকে আরো বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে দামেশকে ফিরে এলেন। এখানে তিনি আবার নিজের অধ্যাপনা, জ্ঞান চর্চা ও সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এ পর্যায়ে তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র আলোচনা ও এর বিভিন্ন মাসায়েল বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। ইমাম ও তার পুর্ব-পুরুষরা ছিলেন হাম্বলী মযহাবের অনুসারী। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনভাবে মাসায়েল আলোচনা করতেন এবং বিভিন্ন মাসায়েলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহী হাদীসের প্রতি নজর রাখতেন। কাজেই বিভিন্ন মাসায়েলে হাম্বলী মযহাবসহ অন্যান্য মযহাবের সাথেও তাঁর বিরোধ বাধে। এমনি একটি বিরোধীয় বিষয় ছিল তাঁর এক বৈঠকে তিন তালাকের তিন তালাক হওয়ার বিষয়টি। চার মযহাবসহ অন্যান্য বহু ইমাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু ইমাম এর বিরোধিতা করেন। তাঁর পক্ষে সহী হাদীসসহ কতিপয় প্রথম শ্রেণীর সাহাবীর মতও ছিল। মুলত এটি ছিল একটি ফিকহী বিরোধ। আর ইসলামী ফিক্‌হে এ ধরনের বিরোধের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সংকীর্ণমনতা এতটুকুও বরদাশত করতে রাজী ছিল না। ইমামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জোয়ার উঠলো। কিন্তু ইমাম নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন।

ইসলামী ফিক্‌হ একটি চলমান ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। কিয়ামত পর্যন্ত এ জীবন বিধান নিজেকে স্বকীয় জীবন ধারায়

প্রতিষ্ঠিত রাখবে। এ চিরপ্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে এই ফিক্‌হের গতিশীলতা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামী ফিক্‌হের এই গতিশীলতা অপরিবর্তিত রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ইসলামী ফিক্‌হ স্থবিরত্বে পৌঁছে গেলে, ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের ধারা শুকিয়ে গেলে নতুন নতুন সমস্যার যথাযথ ইসলামী সমাধান দিতে সক্ষম না হলে ইসলামকে পূর্ণ অবয়বে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। তাই ইমামের অবদান এ ক্ষেত্রে অসামান্য ও অতুলনীয়।

কিন্তু অন্ধকারে থাকতেই যারা অভ্যস্ত, দিন দুপুরের ঝলমলে আলো তারা সহ্য করবে কেমন করে? তাই জায়েয সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশকে বিরোধী পক্ষ বরদাশত করতে পারলো না। এ সময়ে 'হল্‌ফ বিত তালাকে'র বিষয়ের আলোচনা চলছিল জোরেশোরে। লোকেরা বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষ করে লেন-দেনের ক্ষেত্রে তালাক শব্দ ব্যবহার করতো খুব বেশি করে। কোনো বিষয়ে জোর দেবার জন্য বা নিজের দৃঢ় সংকল্প, সদিচ্ছা ও অঙ্গীকারের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য লোকেরা বলতো, 'আমি অবশ্যই এমনটি করবো, নয়তো আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।' 'আমি অবশ্যই উমুক তারিখে তোমাকে টাকাটা দেবো, নয়তো আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।' অথবা 'আমি যদি এ পণ্য-দ্রব্যটি এত টাকায় না কিনে থাকি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।' এ ধরনের বিভিন্ন কথায় ও অংগীকারে তালাক দেয়ার কোনো নিয়তই লোকদের থাকতো না। তাই এটা ছিল আসলে তাদের এক ধরনের কসম। কিন্তু এটাকে শর্তাধীন তালাক বা তালাক বিশ্‌শর্ত মনে করে এর ওপর তালাকের বিধান জারি করা হতো। এভাবে শত শত সংসার ও পরিবার উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এ শব্দটির ব্যবহার চলছিল ব্যাপকভাবে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামানা থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্যকে পাকাপোক্ত করার জন্য বাইয়াতের সংগে তালাক শব্দও ব্যবহারের রেওয়াজ চলে আসছিল। লোকেরা বলতো ঃ 'আমি যদি উমুক শাসকের প্রতি আনুগত্য পরিহার করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।'

এ বিষয়টি সমাজে বিরাট বিশৃংখলা ও জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ বিষয়টির ওপর ব্যাপক চিন্তা-গবেষণা করেন। অবশেষে তিনি এটাকে নিছক একটি হলফ ও অংগীকার বলে গণ্য করেন। এ অংগীকার ভংগ করলে শুধুমাত্র কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন, এর ফলে কোনোক্রমেই স্ত্রী তালাক হবে না। তার এ ফতোয়াটিও প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে পড়ে। ফলে বিভিন্ন মযহাবের উলামা ও কাযীরা তার বিরোধী হয়ে পড়েন। এ ফতোয়া প্রত্যাহার করার জন্য তাঁর উপর চাপ প্রদান করা হয়। প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দিন ইবনে মুসলিম তাঁর সাথে সাক্ষাত করে হলফ বিত-তালাকের ব্যাপারে ভবিষ্যতে ফতোয়া না দেবার জন্য তাঁকে

অনুরোধ জানান। তিনি রাজী হয়ে যান। ইত্যবসরে এ ফতোয়া দান থেকে বিরত রাখার জন্য মিসর থেকে সুলতানের ফরমানও এসে যায়। হাংগামা, গোলযোগ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় তিনি তাদের এ খায়েশ মেনে নেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইমাম তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মনে এ চিন্তা আসে যে, শরীয়তের ব্যাপারে (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তিনি যেটাকে সত্য মনে করেছেন) তার সত্য রায়কে হুকুমতের নির্দেশে গোপন রাখা জায়েজ নয় এবং এ ব্যাপারে এ ধরনের হুকুমতের–যা খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবওয়াত নয়–নির্দেশ মেনে চলা অনুচিত। তাই কিছুদিন পরে লোকদের প্রশ্নের জবাবে ইমাম এ ব্যাপারে আবার ফতোয়া দিতে থাকেন।

ফলে উলামা ও কাযীরা আবার তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁদের সম্মিলিত আবেদনের ফলে গভর্ণর তাঁকে দুর্গের মধ্যে নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অনুযায়ী ৭২০ হিজরীতে তিনি কারারুদ্ধ হন। কিন্তু এবারের কারাবাস মাত্র ৫ মাস স্থায়ী হয়। মিসর থেকে সুলতানের নির্দেশ আসায় কারাগারে প্রবেশের পাঁচ মাস পরে তিনি তা থেকে বের হয়ে আসেন।

এরপর প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর তিনি জ্ঞানচর্চায় তেমন বিশেষ কোন বাধা পাননি। এ সাড়ে পাঁচ বছর তিনি অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম জনগণের ঈমান, আকিদা ও চরিত্র গঠনের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এ সময় তিনি কয়েকটি নতুন গ্রন্থ রচনা করেন।

দামেশকের দুর্গে আটক

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন এবং গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু শত্রুরা তাঁকে নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে দিল না। তারা আবার তাঁকে কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। সংগ্রাম সংঘাতে যার জীবন পরিপূর্ণ তিনি কেমন করে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করতে পারেন। অন্যায়-অসত্যের কাছে যিনি কোনদিন মাথা নত করেননি, তিনি কেমন করে অন্যায় ও অসত্যের রাজত্বে নির্বিঘ্নে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারেন। আর তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে, সমকালীন ইলমী ময়দানে তাঁর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তা জন্ম দিয়েছিল তাঁর একদল স্থায়ী শত্রুর। তারা সব সময় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। তাঁকে কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, কিভাবে তাঁর ক্ষতি করা যায়, তাঁর বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে তাঁকে নতুন ইসলাম আমদানীকারী, বুযর্গানে দীনের অবলম্বিত পথের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং ইসলামের অভিনব ও বিকৃত ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে চিত্রিত করাই ছিল তাদের কাজ।

আর দুর্ভাগ্যবশত সরকারযন্ত্রের চারপাশে এ ধরনের স্বার্থান্ধ আলেমদের ভীড় জমে বেশি। একদল আলেম সরকারী স্বার্থের কাছে নিজেদের দীন ও ঈমান বিক্রি করে সরকারের চাহিদা মতো ইসলামকে কাটছাঁট করতে গিয়ে নিজেদের আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির মধ্যেও কাটছাঁট করতে থাকে। এভাবে এমন এক পর্যায় আসে যখন তারা আর স্বাভাবিক মানবিক অবস্থায় টিকে থাকতে পারে না, মানুষের আকৃতিতে তখন তারা হয়ে উঠে অমানুষ। হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রুরতা, নৃশংসতা, নির্মমতার বন্য স্বভাবগুলো তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তারা নিজেদের হিংস্র আক্রোশ উদগীরণ করেই ক্ষান্ত হয় না। তাকে লাঞ্ছনার শেষ পর্যায়ে উপনীত না করে তাদের মনে শান্তি আসে না।

আবার প্রতিপক্ষ যদি ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যাদাতা হবার সাথে সাথে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়ে অবস্থান করে তাহলেও তাদের আক্রোশ ততটা ফুঁসে ওঠে না। তারা ওটাকে কোনক্রমে হজম করে নেয়। কিন্তু তাত্ত্বিক পর্যায় অতিক্রম করে সঠিক ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিপক্ষের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সূচনা হতেই বা এর কোনো কর্মসূচী হাতে নিতেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। কারণ তারা মনে করে এর আঘাতে সর্বপ্রথম তাদের স্বার্থের প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে। মুসলিম জনতার সামনে তাদের কৃত্রিম নেকী ও ভেজাল ইসলাম ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের স্বার্থচিন্তার বাইরে দ্বিতীয় বৃহত্তর কিছু চিন্তা করার অবকাশ তাদের নেই।

নবুওয়াতের সাতশো বছর পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি ইসলামের যথার্থ রূপটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়ে তুলে ধরে গুটিকয় বইপত্র লিখে ও ফতোয়া দিয়ে বসে থাকেননি। বরং এই সংগে তিনি ইসলামের এই যথার্থ রূপ মুসলিম জনগণের আকীদা বিশ্বাস পুনরগঠনের কাজও চালিয়ে যান। তাঁর ছাত্র ও সমর্থক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি একটি দুর্বার গণবাহিনীও গড়ে তোলেন। এ গণবাহিনীর সাহায্যে সমাজকে শিরক, বিদআত ও দুর্নীতির বিষ বাষ্প থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। এমনকি এর মাধ্যমে সরকারের উপরও প্রভাব বিস্তার করেন। তবে যদি সরকার পরিবর্তন করার কোন পরিকল্পনা বা কর্মসুচী তাঁর থাকতো তাহলে আমাদের বিশ্বাস কোন সরকারও তাঁর প্রতি সহানভূতিশীল ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হতো না। তখন সরকারও তাঁর প্রতি হতো মারমুখী। তখন আলেমদের পরামর্শে সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতো না বরং সরকারের প্ররোচনায় ও নির্দেশে আলেমগণ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিতেন। মূলত আমাদের বক্তব্য হচ্ছে স্বার্থান্ধ আলেম সমাজ ও ইসলামী খিলাফতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত সরকার হামেশা সঠিক ইসলামের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে। সঠিক ইসলামের প্রবক্তারা সবসময় এদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সারাজীবন এদের হাতে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়ে এসেছেন। কাজেই শেষবারের মতো তাঁকে ৭২৬ হিজরীর ৭ শাবান দামেশকের দুর্গে আটক করা হলো। এ আটকের নির্দেশে ইমাম হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠেছিলেন ঃ 'আনা কুন্‌তু মুনতাযিরান যালিকা, ওয়া হা-যা ফীহে খাইরুন কাসীরুন ওয়া মাসালিহাতুন কাবীরাহ।' অর্থাৎ 'আমিতো এর অপেক্ষায় ছিলাম, এর মধ্যে বিরাট কল্যাণ নিহিত ও এর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন রয়েছে।'

ইমামের খেদমত করার জন্য তার ছোট ভাই জয়নুদ্দীন ইবনে তাইমিয়াও গভর্ণরের অনুমতিক্রমে কারাগারে তাঁর সাথে অবস্থান করতে থাকলেন।

ইমামের কারারুদ্ধ হবার পর শত্রুপক্ষ ইমামের দলবলের ওপরও হাত উঠালো। বিভিন্ন স্থানে তারা আক্রমণ চালালো। ইমামের একদল সমর্থককে গ্রেফতার করে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর প্রদক্ষিণ করালো। অবশেষে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে নির্দেশ হাসিল করে একদল সমর্থককে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। কিছু দিন পর আবার তাদের মুক্তি দেয়া হলো। কিন্তু ইমামের শ্রেষ্ঠ শাগরিদ আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়েম তাঁর সাথে থাকলেন।

ইমামের কারাদণ্ড একদল বিকৃতমনা ইসলাম ব্যবসায়ীর মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলেও হক্কানী আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমান এ ঘটনায় ভীষণ মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হলো। তারা একে সুন্নাতের মোকাবিলায় বিদআতের এবং হকের মুকাবিলায় বাতিলের বিজয় মনে করলো। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রেষ্ঠ আলেমগণ কায়রোয় সুলতানের কাছে পত্র পাঠাতে লাগলেন। তাঁরা যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামের শক্তিশালী কণ্ঠকে এভাবে কারাগারে আটক রাখার বিরুদ্ধে নিজেদের আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

কেবলমাত্র বাগদাদের আলেমগণ সম্মিলিতভাবে যে স্মারকলিপি সুলতানের কাছে পাঠান তার একটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ 'শায়খুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়ার ওপর জুলুম করা হচ্ছে শুনে পূর্ব এলাকার দেশগুলো এবং ইরাকের ইসলাম প্রিয় দীনদার লোকেরা ভীষণ মর্মাহত হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম বিরোধীরা আনন্দে নাচতে শুরু করেছে। স্বার্থবাদী ও বিদআতী মহলও এতে খুশি হয়েছে। এসব এলাকার আলেমগণ যখন দেখলেন বিদআতী ও বাতিল পন্থীরা আলেমদের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগে আনন্দে হাততালী দিয়ে বেড়াচ্ছে তখন তারা এ অবাঞ্ছিত ঘটনাটির খবর সরকারকে দেয়া জরুরী মনে করলো। এই সাথে তারা শায়খের ফতোয়ার

সমর্থনে নিজেদের জবাবও লিখে পাঠাচ্ছে। তারা শায়খের ইলম, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের মনোভাবও এখানে ব্যক্ত করেছে। এসব কিছুর মূলে দীনকে মর্যাদাশালী দেখার ও সুলতানের প্রতি কল্যাণ কামনার মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নেই।'

কারাগারে ইমামের তৎপরতা

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা দুনিয়ার কোনো বাধাকে বাধা বলেই মনে করে না। অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোনো পরিবেশেই তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে। একটা অনুকূল পরিবেশের আশায় তারা নিজেদের কাজ ও প্রোগাম স্থগিত রেখে চুপচাপ বসে থাকে না। কোন কারাপ্রাচীর এ ধরনের মর্দে মুজাহিদদের কর্মস্পৃহাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। একদিকের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তারা অন্যদিকের কাজের দরজা খুলে দেন।

দামেশকের কারাগারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াও সেই একই পথ অবলম্বন করলেন। বাইরে তিনি জ্ঞানের প্রসার, সংস্কার ও চরিত্র গঠনের যে দায়িত্ব পালন করছিলেন কারাগারে আটক থাকার কারণে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলো ঠিকই কিন্তু এতে তিনি মোটেই দমলেন না। কারাগারে একদিকে তিনি নিজের ইবাদত বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায় মন দিলেন বেশি করে। বিশেষ করে নিজের আগের লেখা বইগুলোর সংস্কার ও সম্পাদনায় ব্রতী হলেন। এ সময় তিনি কুরআন গবেষণায় ও কুরআনের জটিল গ্রন্থগুলো উন্মোচনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সম্ভবত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি যে পরিপক্কতায় এসে পৌঁচেছিলেন তার সাথে কারাগারের নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ তাঁকে এ কাজে পারদর্শী করে তুলেছিল।

আস্তে আস্তে জেলের পরিবেশ তাঁর কাছে সহনীয় ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এখানে বসে বসে তিনি যা কিছু লিখতেন কিছুক্ষণের মধ্যে কারাগারের বাইরে তা ছড়িয়ে পড়তো। সারাদেশেও তা ছড়িয়ে পড়তো মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে। জেলের বাইরে থেকে লোকেরা তাঁর কাছে ফতোয়া জানতে চেয়ে চিঠি লিখে পাঠাতো। জেলের মধ্যে বসে তিনি তার জবাব লিখে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। কাজেই এ অবস্থায় জেলের ভেতর ও বাইর তাঁর জন্যে সমান হয়ে দাঁড়ালো। বরং জেলের মধ্যে বসে তিনি নিশ্চিন্তে নিজের মত প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন।

এ সময় তিনি মিসরের মালেকী মযহাবের কাযী আবদুল্লাহ ইবনুল আখনায়ীর একটি মতের কঠোর সমালোচনা করলেন। এ সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি কাযী সাহেবের শরীয়ত ও ফিক্‌হের জ্ঞানের অপ্রতুলতা সম্পর্কেও মন্তব্য

করলেন। এ মন্তব্য কাযী সাহেবের ক্রোধকে উদ্দীপিত করলো। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সুলতানের দরবারে নালিশ করলেন এবং ইমামের বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে নিজের মনের ঝাল মিটালেন।

বই কলম ছিনিয়ে নেয়া হলো

সুলতান ফরমান জারি করলেন ঃ ইমামের কাছে কাগজ কলম, দোয়াত ইত্যাদি যা কিছু লেখার সরঞ্জাম আছে ছিনিয়ে নেয়া হোক। বইপত্রও সব সরিয়ে নেওয়া হোক। তিনি যেন আর লেখাপড়া করতে না পারেন। তাঁর মতামত যেন আর কোনক্রমেই জনসমক্ষে প্রচারিত হতে না পারে।

একজন লেখক, সমালোচক ও সমাজ সংস্কারকের জন্য বোধহয় এর চেয়ে বড় আর কোন শাস্তি নেই। হয়তো মৃত্যুদণ্ড তাঁর কাছে এর চেয়ে শতগুণ সহজ। ৭২৮ হিজরীর ৯ জমাদিউস সানী সরকারী ফরমান অনুযায়ী তাঁর সব কাগজপত্র ও লেখার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হলো। এগুলো আদালতের লাইব্রেরীতে দাখিল করে দেয়া হলো। এখানে তাঁর প্রায় ৬০ খানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।

সরকারের এ দমননীতিতে ইমাম একটুও দমলেন না। তিনি সরকারের কাছে কোনো অনুযোগ অভিযোগও করলেন না। নিরবে সব সহ্য করে গেলেন। দোয়াত, কলম, খাতাপত্র ও কাগজ কেড়ে নেবার পর তিনি বিচ্ছিন্ন ও টুকরো কাগজ কুড়িয়ে জমা করলেন। সেগুলোর ওপর কয়লা দিয়ে লিখতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এভাবে লিখিত তাঁর কয়েকটি পুস্তিকা পাওয়া গেছে। এগুলো বহুকাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। জীবনের এ অবস্থায়ও তিনি জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন বলে মনে করতেন। মিসরীয় লেখক শায়খ আবু যোহরা তাঁর 'ইবনে তাইমিয়া' গ্রন্থে ইমামের এ সময়কার লিখিত একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন। এ পত্রে তিনি বলেছেন ঃ

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর পথে অনেক বড় জিহাদে লিপ্ত রয়েছি। এখনকার জিহাদ তাতারী সম্রাট কাযানের বিরুদ্ধে জিহাদ বা জাহামীয়া ও সর্বেশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমাদের অতীতের জিহাদগুলোর চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এটা আমাদের ও জনগণের ওপর আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক এর তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম।'

পরকালের পথে যাত্রা

ইমামের সময়ও শেষ হয়ে এসেছিল। মৃত্যু শয্যায় দামেশকের গভর্ণর তাঁকে দেখতে এলেন। গর্ভণর শোকাভিভূত কণ্ঠে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জবাবে ইমাম বললেন ঃ আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আপনাকে আমি মাফ করে দিয়েছি। আমি তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছি যারা আমার সাথে শত্রুতা

করেছে। আমার বক্তব্যের ও কর্মকাণ্ডের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিল না এবং এখনো নেই। আমি সুলতানকেও মাফ করে দিয়েছি। কারণ সুলতান স্বেচ্ছায় নয় বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। আমি সবাইকে এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দিয়েছি। তবে সেই ব্যক্তিকে আমি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারি না, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রু এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আক্রোশের বশবর্তী হয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে এবং আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

৭২৮ হিজরীর ২২ জিলকদ ৬৭ বছর বয়সে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। দুর্গের মুয়ায্যিন মসজিদের মিনারে উঠে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। দুর্গের চারদিকের উঁচু বুরুজগুলো থেকে সমস্বরে এ ঘোষণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সংগে সংগে শহরের মসজিদগুলো থেকে শোক বার্তা ইথারে ইথারে চতুর্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মুহূর্তে শহরের সমস্ত আনন্দ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়। শোকের ছায়া নেমে আসে অলিতে-গলিতে, রাজপথে, অলিন্দে, গৃহকোণে, মানুষের মুখে-চোখে। দুর্গের পথে ঢল নামে শোকাহত মানুষের। শত্রুরাও শত্রুতা ভুলে যায়। তারাও মুর্চ্ছিত, বেদনাহত।

দুর্গের সদর দরজা খুলে দেয়া হয়। লোকেরা দলে দলে যেতে থাকে ইমামের মরদেহ এক নজর দেখে হৃদয়ের শোকাবেগকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রশমিত করতে। গোসলের পর তাঁর জানাযা শহরের বৃহত্তম মসজিদ জামে উমুবীতে আনা হয়। দুর্গ ও জামে উমুবীর মধ্যকার দীর্ঘ রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়। ভীড় থেকে জানাযাকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যবস্থাপনায় লাশ জামে মসজিদে আনা হয়। তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদ ছিল জামে উমুবী। এ মসজিদ ভরে গিয়ে সামনের ময়দান, রাজপথ, আশপাশের অলি-গলি, বাজার সব লোকে ভরে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বের আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

এদিন শহরের দোকান-পাট সব বন্ধ থাকে। বহু লোক রোজা রাখে এবং বহু লোক খাবার কথা ভুলে যায়।

জানাযা গোরস্তানের দিকে নিয়ে যাবার সময়ও লোকের ভীড়ে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। ফজরের পর দুর্গ থেকে জানাযা বের করা হয়। যোহরের পর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং জনতার ভীড় ঠেলে নিকটবর্তী গোরস্তানে পৌঁছতে আসরের ওয়াক্ত হয়ে পড়ে।

অতি অল্প সময়ে ইমামের মৃত্যু সংবাদ সারা ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

ইমামের তাজদীদী কার্যক্রম

আল্লাহ তাঁর দীনকে নবীদের মাধ্যমে মানুষের সামাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য নবীর পর নবী এসেছেন। এক একটি যুগ-সীমানা চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে এক একজন নবী এসেছেন। আবার একযুগে এক সঙ্গে কয়েকজন নবীও এসেছেন। দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে একই সময়ে কয়েকজন নবী আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে গেছেন। এমনকি একই দেশে আল্লাহ একই সংগে একাধিক নবী পাঠিয়েছেন। তাঁদের একজনকে বানিয়ে দিয়েছেন অন্য জনের সহযোগী। এভাবে দেখা যায় মানব জাতির ইতিহাসে নবীদের সিলসিলা কখনো বিচ্ছিন্ন বা ক্ষণকালের জন্য হলেও স্থগিত হয়নি। মানুষকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেননি। তাই মানুষের ইতিহাসের সাথে সাথে নবীদের ইতিহাসও সমান্তরাল রেখায় চলে এসেছে। বরং বলা যায় নবীরাই মানুষের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো নবী নেই। এরপর যত দীর্ঘকাল যত হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাক না কেন আল্লাহ তা'আলা আর কোনো নবী পাঠাবেন না বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। এ সময় উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে থেকে এমন সব দীন ও শরীয়তের নির্ভুল জ্ঞান সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক মর্দে মুজাহিদকে তিনি এগিয়ে আনবেন যারা সত্যিকার অর্থে দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব পালন করবেন। এ সম্পর্কে ইমাম আবুদাউদ তাঁর গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

অর্থাৎ 'প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে আল্লাহ এই উম্মতের জন্য এমন লোক সৃষ্টি করবেন যিনি উম্মতের জন্য তার দীনকে সবল ও সতেজ করবেন।' আল্লাহর এই সত্যনিষ্ঠ বান্দাগণ মহানবীর স. দীন ও শরিয়তের তাজদীদ বা পুনরুজ্জীবনের কাজ করেন বলেই তাদেরকে বলা হয় মুজাদ্দিদ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তেমনি একজন মুজাদ্দিদ। সপ্তম অষ্টম হিজরী শতকে তিনি ইসলামী শরীয়তের জন্য নবুওয়াতের সাতশো আটশো

বছরের মধ্যে দীন ও শরীয়তের ওপর যে ময়লা ও আবর্জনার পলেস্তারা জমে উঠেছিল তা ধারালো অস্ত্র দিয়ে চেঁছে ফেলে দেন। ইসলাম তার ভেতরের ঔজ্জল্যে আবার ঝকমকিয়ে ওঠে। তাঁর পূর্বে আরো বহু মুজাদ্দিদ ইসলামকে এভাবে বাইরের আবর্জনা মুক্ত করে গেছেন। কিন্তু তাঁর কাজটি ছিল মনে হয় তাঁদের সবার চাইতে অনেক বেশি ব্যাপক, সুস্পষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই তাজদীদী কাজকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) তওহীদী আকীদার পুনরুজ্জীবন এবং মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি। (২) দর্শন, ন্যায় শাস্ত্র ও কালাম শাস্ত্রের সমালোচনা এবং কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিভংগী ও যুক্তি উপস্থাপন পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দান। (৩) ইসলাম বিরোধী ধর্ম, ফেরকা, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনা এবং তাদের চিন্তা, কর্ম ও আচরণের মোকাবিলা করা। (৪) শরীয়তের ইলম ও ইসলামী চিন্তার পুনরুজ্জীবন।

ইমামের সময় স্বদেশে-বিদেশে উলামার সংখ্যা কিছু কম ছিল না। বড় বড় ও বিশ্ব জোড়া খ্যাতি সম্পন্ন আলেমের সংখ্যাও তখন যথেষ্ট ছিল। তাঁদের বৃহদাকার কিতাবগুলো, তাঁদের পাণ্ডিত্যের বিপুলায়তন প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। হাদিস, ফিক্‌হ, তাফসীর, উসূল ও কালাম শাস্ত্রে তাদের পাণ্ডিত্য ছিল গগনচুম্বী। সম্ভবত তারা যুগের ফিতনাগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু এর মোকাবিলায় কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। বক্তৃতা, লেখনী ও সংগঠন এ তিনটি শক্তির কোনো একটিকে ব্যবহার করেছেন এমন কোনো আলেমের নাম তৎকালীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যুগের গতি ধারায় আত্মসমর্পণ করে সবাই যেন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলছিলেন। এ গৌরব একমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্য নির্দিষ্ট। যুগের ফিতনাকে তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করে ইসলামকে তার যথার্থ রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলামী সমাজকে শিরক ও বিদআতের দূর্গন্ধ মুক্ত করে সেখানে যথার্থ তওহীদ ও রিসালাতের স্বচ্ছ স্রোতধারার স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে স্বত-উৎসারিত করে গেছেন। এটাইতো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের কাজ। এক্ষেত্রে তিনি নবীদের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। দীনের মুজাদ্দিদগণ আসলে নবীদের দায়িত্বই আনজাম দিয়ে যান।

ইমাম যে সমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন সেটা কোন ধরনের সমাজ ছিল? যথার্থ ইসলামী সমাজের সাথে তার কতটুকু সম্পর্ক ছিল, এটা যথাযথভাবে অনুধাবন করার মতো একটি বিষয়। অমুসলিম ও বিভিন্ন অনারব জাতিদের সাথে মেলামেশা এবং ইসমাঈলী ও বাতেনী শাসকদের প্রভাব আবার এর সংগে একদল অজ্ঞ ও গোমরাহ সূফীর শিক্ষা

ও কর্মের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শিরক মিশ্রিত আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। ইহুদী নাসারাদের মতো মুসলমানরাও প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অমুসলিমরা তাদের মহাপুরুষদের কবরে গিয়ে যা কিছু করতো মুসলমানরাও নিজেদের বুযর্গানে দীনদের মাজারে গিয়ে তারই পুনরাবৃত্তি করতো। তারা কবরবাসীদের কাছে ফরিয়াদ জানাতো, সাহায্য চাইতো– যেমন আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়। ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'আররদ্দু আলাল বিকরী' গ্রন্থে এসব লোকের কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'তাদের অনেকে কবরে শায়িত ব্যক্তিকে আল্লাহর মর্যাদা দিয়েছে এবং ঐ কবরের খাদেম যিন্দাপীরকে পয়গম্বরের আসনে বসিয়েছে। তারা মৃতের কাছে নিজের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা ঐ যিন্দাপীর খাদেমকে এমন উচ্চ আসনে বসিয়েছে যে, সে যেটাকে হালাল বলবে সেটা হালাল আর যেটাকে হারাম বলবে সেটা হারাম হয়ে যাবে। তারা আসলে আল্লাহকে ইলাহর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

এইসব শিরক ও বিদআতপরস্তদের সম্পর্কে তিনি 'আররদ্দু আলাল আখনায়ী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'অনেকের বিশ্বাস, যে মহল্লা বা জনপদে কোনো বুযর্গের মাজার থাকে তারই বরকতে এলাকার অধিবাসীরা রিযিক পেয়ে থাকে, সাহায্য লাভ করে থাকে এবং দুশমনদের আক্রমণ থেকে সংরক্ষিত থাকে। তারই বরকতে দেশও দুশমনের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা এ ধরনের আকীদা রাখে তার সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি হচ্ছেন অমুক শহরের রক্ষক। যেমন সাইয়েদ নাফীসা মিসর ও কায়রোর রক্ষক। অমুক অমুক বুযর্গ দামেশকের রক্ষক। অমুক অমুক বুযর্গ বাগদাদ প্রভৃতি শহরে প্রহরারত আছেন। তাদের আকীদা হচ্ছে, ঐসব নবী ও সৎ লোকদের কবরের বরকতে সংশ্লিষ্ট শহর ও জনপদগুলো বালা মুসিবত থেকে সংরক্ষিত আছে।

'দুশমনরা যখন বাগদাদ ও দামেশকের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল তখন তারা অলী ও বুযর্গদের মাযারে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছিল, আল্লাহর দরবারে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনি।'

মুসলমানদের আকীদাকে শিরক মুক্ত করার প্রচেষ্টা

মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটার স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ। তার মধ্যে যা কিছু বিমূর্ত গুণাবলী রয়েছে সেগুলোও আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এসবের জন্য কোন কৃতিত্ব মানুষের প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহর। তাই কুরআনের শুরুতেই বিশ্ব জগতের যে কোন বিষয়ের যে কোন কৃতিত্বের মূল অধিকারী হিসেবে সমস্ত প্রশংসার

মালিক একমাত্র আল্লাহকেই ঠাওরানো হয়েছে। বলা হয়েছে–'আলহামদুলিল্লাহ।' মানুষ জীবিত হোক বা মৃত তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠ একমাত্র আল্লাহ। 'আল্লাহু আকবর'।

কিন্তু মানুষের গোমরাহীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ ইতিহাসের প্রথম থেকেই মানুষ মানুষের পূজা করে আসছে। এটা জীবিত ও মৃত উভয় পর্যায়েই স্থান করে নিয়েছে। বীর পূজা, আউলিয়া পূজা, পীর পূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এটা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমানরা কোন দিন প্রকাশ্য শিরক বা মুর্তি পূজায় লিপ্ত হবে না । অবশ্যি মুসলমানরা কোন দিন প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু শিরক মিশ্রিত কার্যকলাপ তাদের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই মূর্তি পূজার পরিবর্তে মুসলমানদের একটি গ্রুপ আউলিয়া পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কবরের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে শহীদদের মাজার। এগুলোকে বলা হয় 'মাশহাদ' বা 'মাশাহিদ'। আউলিয়া পূজা ও মাশহাদ পূজার কারণে মসজিদের তুলনায় মাশহাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। লোকেরা মাজার আর মাশহাদের যিয়ারতে মেতে ওঠে। এগুলোই সাধারণ ও জাহেল মুসলমানদের কিবলায় পরিণত হয়। ইসলামী জাহানের বিভিন্ন নগরে বন্দরে এসব মাজার ও মাশহাদের জাল বিস্তৃত হয়। রাতারাতি হাজার হাজার মাশহাদ ও মাজার গড়ে ওঠে। সুলতান, বাদশাহ ও আমীরগণ এগুলোর পিছনে দরাজ হস্তে অর্থ সম্পদ ব্যয় করেন। এগুলোর নামে অনেক সম্পত্তিও ওয়াকফ করা হয়। এগুলোর ওপর বড় বড় ইমারত ও গম্বুজ বানানো হয়। এগুলো দেখাশুনা করার জন্য খাদেম, ঝাড়ুদার ও কর্মচারীদের এক বিরাট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। লোকেরা জাঁকজমকের সাথে এগুলো যিয়ারত করার জন্য সফর করতে থাকে। আল্লাহ্র ঘর যিয়াতরকারী হাজীদের কাফেলার মতই দেখা যায় তাদের কাফেলা। আবার অনেক সময় দেখা যায় তার চাইতেও বড়। এভাবে মসজিদ থেকে মাশহাদের দিকে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এভাবে কাবাঘরের পরিবর্তে মাজার ও মাশহাদ মুসলমানদের দীনি জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার রচনাবলীর বিরাট অংশ জুড়ে আছে সেকালের মুসলমানদের এই গোমরাহীর আলোচনা। ইমাম দেখিয়েছেন, জাহেল ও স্বার্থান্বেষী মুসলমানদের মধ্যে এ ফিতনাটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সব চাইতে বেশি সাহায্য করেছে মিসরেরর বাতেনী তথা ফাতেমী শাসকরা। তিনি এও দেখিয়েছেন যে রাফেযী ও শিয়ারা শুরু থেকেই মসজিদের চাইতে মাশহাদকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। হারামাইন (মক্কা-মদীনা) শরীফের চাইতে নজফ ও কারবালার সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক বেশি।

অবশ্য ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্মের পূর্বেই মিসরের ফাতেমী শাসকদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের মানসিক, সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক প্রভাব মুসলিম সমাজেরর ওপর তখনো ছিল সক্রিয়। বিশেষ করে সিরিয়ায় শিয়া ও ইসমাঈলীদের সংখ্যা ছিল বিপুল। একই সমাজে বাস করার কারণে সাধারণ মুসলমানদের ওপর তাদের প্রভাব পড়ছিল। এই সংগে সুফীবাদের ইসলাম বিরোধী ধারাটির অবদানও কম ছিল না। এই গোমরাহ সুফী দর্শনে মাজার ও মাশহাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্রতা আরোপ করা হয়েছিল। তারা এসব মাজার ও মাশহাদে বার্ষিক জলসা বা উরুস অনুষ্ঠান করতো। এসব মাজার ও মাশহাদের উল্লেখ করে ইমাম তাঁর 'আররদ্দু আলাল বিকরী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'অনেকে কবরে হজ্ব করে। অনেকে আবার এ সফরের আদব ও নিয়ম-কানুনের ওপর বিশেষ বইপত্র লিখেছে। এসব গ্রন্থের নামকরণ তারা এভাবে করেছে–যেমন, 'আল-মানাসিকুল হাজ্জিল মাশাহিদ।' অর্থাৎ মাশহাদগুলোয় হজ্বব্রত সম্পাদন করার নিয়ম-কানুন। জনৈক শিয়া আলেম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নোমানও এনামে একটি বই লিখেছেন। এ গ্রন্থে তিনি আহলে বায়েতের নামে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আসলে ভিত্তিহীন।

এ গ্রন্থের অন্য একস্থানে ইমাম লিখেছেন ঃ 'অনেক লোক এইসব কবর ও মাশহাদে হজ্জ করাকে কাবা শরীফে হজ্জ করার ওপর অগ্রাধিকার দেয়। তারা বলে থাকে, উমুক বুজুর্গের মাজার তিনবার যিয়ারত করলে তা কাবা শরীফের একটি হজ্বে পরিণত হয়।'

এভাবে সপ্তম অষ্টম হিজরীতে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে মসজিদগুলো বিরান হয়ে যেতে থাকে এবং তার তুলনায় মাজার ও মাশহাদগুলোর চাকচিক্য ও জাঁকজমক বেড়ে যায়। সেগুলোর আঙিনা সবসময় গুলজার থাকে। অনেক সময় মসজিদগুলো রাতের বেলা আঁধারে ঘিরে থাকে। মাজার আর মাশহাদগুলোয় ঘিয়ের প্রদীপ ও ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলতে থাকে সারারাত। কখনো হয়তো মহল্লার গরীব মুসলমানরা মসজিদে কিছুটা আলোর ব্যবস্থা করে। তারাই মসজিদ আবাদ করে। নয়তো ধনীরা মসজিদের দিকে নজর দেবার ফুসরত পায় না। তাদের অর্থ মাজারের পেছনে ব্যয় হয়।

এ সময় বিভিন্ন দেশে বড় বড় ও শক্তিশালী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যাপনা করছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের এসব আকিদা ও আমলগত গোমরাহীর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন তারা অনুভব করেননি। বরং তাদের অনেকে এসব আকায়েদ ও আমল সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তাদের রচনাবলী ও ফতোয়াসমূহ অধ্যয়ন করলে তাদের এই সংশয়ের আভাস পাওয়া যাবে। এ যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ আলেম ইবরাহীম আখনায়ী ও

ইয়াকুব আল বিকরীর গোমরাহ চিন্তাধারার সমালোচনায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিশেষভাবে লিখিত দুখানা গ্রন্থই তার প্রমাণ। মূলত সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রচলিত চিন্তা, আকীদা বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করার দিকে তারা অগ্রসর হননি। অথচ ইসলামের মূল উৎসই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া আলেম সমাজকে এই উৎসের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ভ্রান্তি উন্মোচন

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি মুশরিকী আকীদা বিশ্বাসের প্রভাবমুক্ত করে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে পুনরগঠিত ও পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা ছিল তাঁর প্রথম সংস্কারমূলক কাজ। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এবার তাঁর দ্বিতীয় সংস্কারমূলক কাজটির আলোচনা করতে চাই। ইমামের দ্বিতীয় সংস্কারমূলক কাজটি ছিল দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও কালাম শাস্ত্রের সমালোচনা এবং তার পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহের যুক্তি গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন। তাঁর এ কাজটির গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বুঝতে হলে সেকালের মুসলিম শিক্ষিত সমাজে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের অবস্থান জানতে হবে। মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ সমাজ দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রকে কতবড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন তা জেনে নিতে হবে আগে।

বনু উমাইয়া আমল থেকে আরবীতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদের কাজ শুরু হলেও আসলে আব্বাসীয় আমলে তা ব্যাপক রূপ লাভ করে। আব্বাসীয় বাদশাহ মনসুরের আমল থেকে (সম্ভবত ১৩৬ হিজরী) গ্রীক দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের আরবীতে অনুবাদের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তবে বাদশাহ মামুনের সময়ে এসে তার ব্যাপকতা এত বেড়ে যায় যে, তা রীতিমত একটি আন্দোলনের রূপলাভ করে। মামুন নিজে এ ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহী ছিলেন যে, রোমের বাদশাহের কাছে গ্রীক দর্শন সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলো পাঠাবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। রোম সম্রাটও আফলাতুন (প্লেটো), আরাস্তু তালিস (এরিষ্টটল), সুকরাত (সক্রেটিস), জালিনুস, উকলিদাস, বাতলিমুস প্রভৃতি দার্শনিকদের গ্রন্থগুলো পাঠান। মামুন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সেগুলোর অনুবাদ করান। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলোর প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। লোকদেরকে এ গ্রন্থগুলো পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম সমাজে গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, চতুর্থ হিজরীর শেষ অব্দে গ্রীক দার্শনিকদের প্রায় সমস্ত বড় বড় গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে আরাস্তুর (এরিষ্টটল) গ্রন্থগুলো। আরাস্তু তাদের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। এটাকে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে

যে, আরাস্তুসহ যেসব গ্রীক দার্শনিকের চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের একজনও আল্লাহ প্রেরিত দীন ও নবুওয়াত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তাদের চিন্তার সাথে আল্লাহ প্রেরিত দীন ও আসমানী কিতাবগুলোর ছিল সুস্পষ্ট বিরোধ। সেগুলো ছিল মূলত বস্তুবাদী চিন্তা ও জীবন দর্শনের ধারক।

প্রথম দিকে ইসলামী বিশ্বের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ আরাস্তুর চিন্তা ও দর্শনকে চোখ বুজে স্বীকার করে নেননি। তাঁরা এর সমালোচনা করেন। একে ভূলের উর্ধে মনে করেননি। অনেকেই এর সমালোচনায় বই লিখেছেন। যেখানেই গ্রীক চিন্তার দুর্বলতা তাদের চোখে পড়েছে সেখানেই তারা বেধড়ক সমালোচনা করেছেন। যে মুতাজিলারা গ্রীক দর্শনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছিলেন তারাই ছিলেন আবার তার সবচেয়ে বড় সমালোচক। তাদের মধ্যে নিজাম ও বু আলী জিবাইর নাম সবার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয় হিজরীতে হাসান বিন মুসা তাঁর কিতাবুল আরা ওয়াদদীয়ানাত গ্রন্থে আরাস্তুর ন্যায়শাস্ত্রের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমালোচনা করেন। চতুর্থ হিজরীতে ইমাম আবুবকর বা-কিল্লানী 'দাকায়েক' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। এ গ্রন্থে তিনি গ্রীক দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেন এবং গ্রীক দর্শনের ওপর আরবীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। পঞ্চম হিজরীতে আল মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থের লেখক আল্লামা আবদুল করীম শাহরিস্তানী আরাস্তু ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার সমালোচনায় একটি বই লেখেন এবং ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তাদের যুক্তিগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন। এ শতকের শেষের দিকে ইমাম গাযালী রহঃ তাঁর 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার গলদ এমনভাবে সুস্পষ্ট করে দেন যার ফলে একশো বছর পর্যন্ত গ্রীক দর্শনের সুউচ্চ প্রাসাদে কম্পন অনুভূত হতে থাকে। ষষ্ঠ শতকে আবুল বারাকাত বাগদাদী ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীও এই গ্রীক দর্শনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালান।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মুসলিম বিদগ্ধ সমাজের যে অংশটি গ্রীক দর্শনের ধারক ছিল, গ্রীক দর্শনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রসারকে যারা নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করছিল, তারা ছিল আরাস্তুর ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের পূজারী। আরাস্তুর চিন্তা ও দর্শনকে তারা সকল সমালোচনার উর্ধে মনে করতো। কালের আবর্তনের সাথে সাথে আরাস্তুর প্রতি তাদের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য বেড়েই চলছিল। এ ব্যাপারে মুসলিম দার্শনিক আবু নসর ফারাবী (৩৩৯ হিঃ–৯৫০ খৃঃ) বু আলী ইবনে সীনা (৪২৮ হিঃ) এবং স্পেনে ইবনে রুশদ-এর (৫৯৫ হিঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে সিনা আরাস্তু প্রেমে এতই মাতোয়ারা যে তাঁর মতে আরাস্তুর পর শত শত বছর অতিক্রান্ত হলেও আজো ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার চাইতে বেশি ও নতুন কিছু কেউ লিখতে পারেননি। এবং তাঁর যুক্তির ওপর কারোর যুক্তি স্থান

পায়নি। তিনিই যেন সত্যের একমাত্র মানদণ্ড। বু আলী সিনার চাইতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন ইবনে রুশদ। সুফীদের পরিভাষা মোতাবেক বলা যায় যে, আরাস্তুর ব্যাপারে তিনি 'ফানা ফিশ্‌শায়খ'-এর পর্যায়ে অবস্থান করতেন। বিখ্যাত লেখক লুতফী জুময়া তাঁর 'তারিখু ফালা সিফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব' গ্রন্থে ইবনে রুশদের একজন জীবনীকারের বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ 'আরাস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার ব্যাপারে ইবনে রুশদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। এমন কি তিনি তাঁকে খোদা বানাতেও প্রস্তুত ছিলেন। বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে মানুষের পর্যায় থেকে আরাস্তু অনেক ওপরে পৌঁছে গিয়েছিলেন বলে তিনি মনে করতেন। এমন কি ইবনে রুশদ যদি একাধিক ইলাহ–মতবাদের সমর্থক হতেন তাহলে তিনি আরাস্তুকে রব্বুল আরবাব অর্থাৎ সমস্ত খোদার বড় খোদা বলে মেনে নিতেন।'

সপ্তম হিজরী শতকে গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন নাসিরুদ্দীন তুসী। তাকে মুহাক্কিক তুসীও বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল তাতারী আক্রমণের যুগ। ইসলামী দুনিয়ার বৃহত্তম অংশ এ আক্রমণে বিধ্বস্ত হচ্ছিল। এই সংগে জ্ঞানগত ক্ষেত্রেও মুসলমানরা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে অবস্থান করছিল। তুসী ছিলেন মুসলমানদের শত্রু তাতারী সম্রাট হালাকু খানের বিশ্বস্ত অনুচর। তুসীর ছাত্রবৃন্দ এ সময় এবং এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেন। তাদেরই প্রচেষ্টায় ইরানে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে দর্শন ও মানতেক বা ন্যায়শাস্ত্র। (পরবর্তীকালে এরি একটি সুসংস্কৃত সংস্করণ দরসে নিজামী নামে হিন্দুস্তানের মাদ্রাসাগুলোতে চালু হয় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন) নাসিরুদ্দীন তুসী ও তার শাগরিদবৃন্দ আরাস্তুকে 'আক্‌লে কুল'–সমগ্র জ্ঞানময় সত্তা বা পূর্ণ জ্ঞানময় সত্তা মনে করতেন এবং তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধানকে চূড়ান্ত আখ্যা দিতেন। ইমাম রাযীর মোকাবিলায় তারা আরাস্তুর দর্শন সমর্থন করেন জোরেশোরে এবং এভাবে তারা আরাস্তুর দর্শনকে নব জীবন দান করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্ম হয় নাসিরুদ্দীন তুসীর মৃত্যুর দশ বছর আগে। ইবনে তাইমিয়া যখন জ্ঞান জগতে প্রবেশ করেন তখন চতুর্দিকে দর্শন ও মানতেকের রাজত্ব ছিল। নাসিরউদ্দীন তুসী ও তাঁর শাগরিদরাই ছিলেন এর প্রধান ধারক। মানতেক ও ফালসফার (দর্শন) ভাষাই তখন ছিল ইলমের ভাষা। মানতেক ও ফালসফায় যে যত পারদর্শী সেই তত বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিবেচিত হতো। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের এ ময়দানে কোন গুরুত্ব ছিল না। তারা সবাই প্রায় এ পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছিলেন। দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র যে ক্ষেত্রে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে যাচ্ছিল সে ক্ষেত্রে তারা মাথা হেঁট করে চলাকেই নিজেদের মর্যাদা রক্ষার গ্যারান্টি মনে করেছিলেন। এ অবস্থায় দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের কঠোর ও নির্ভীক সমালোচনার

প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আরাস্তুর ব্যক্তিত্ব যে অতি মানবিক নয় এবং তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধান চূড়ান্ত নয় বরং তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, একথা প্রমাণ করার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল।

এ দায়িত্ব ইমাম ইবনে তাইমিয়া পালন করেন। এ দায়িত্ব তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেন যে, সাতশো বছর পর সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আজো এর প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে। আজকের পাশ্চাত্য দর্শনের মূলেও রয়েছে এই গ্রীক দর্শন। আর এ গ্রীক দর্শনের ভ্রান্তি উন্মোচন করে দিয়ে তিনি আজকের পাশ্চাত্য দর্শনের গলদ নির্দেশের পথও উন্মুক্ত করে গেছেন। এই সংগে কুরআনী যুক্তিবাদিতার সারল্য, হৃদয়গ্রাহিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করারও পথ দেখিয়ে গেছেন।

কুরআনের যুক্তি গ্রহণ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

যে জ্ঞান আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন তা মানুষ নিজের চেষ্টায় কোনক্রমেই লাভ করতে পারে না। সারা দুনিয়ার সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষটিও যদি এ ব্যাপারে শত বছর ধরে চিন্তা-গবেষণা করেন তাহলে শত বছর পরেও দেখা যাবে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে শত বছর আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক কদমও তিনি সামনে এগিয়ে যেতে পারেননি। গ্রীক দর্শন বিশ্ব জ্ঞান ভাণ্ডারে যা উপহার দিয়েছে তা এর চাইতে বেশি কিছু নয়। গ্রীসের বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতি বিশ্বমানব সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. ও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন আরব ও ইসলামী বিশ্ব এগুলোর চর্চা করে সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তিনি অবাক হয়েছেন যখন তিনি দেখেছেন আল্লাহ, ফেরেশতা ও পরকাল সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা। তিনি 'আররদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন' গ্রন্থে লিখছেন ঃ

'আল্লাহ সম্পর্কে প্রথম শিক্ষক আরাস্তুর রচনা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে একজন সাধারণ শিক্ষিত লোককে অবাক হতে হয়। তাকে শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, দুনিয়ায় বোধ হয় এই গ্রীক দার্শনিকদের চাইতে রব্বুল আলামীন সম্পর্কে বেশি অজ্ঞ আর কেউ নেই। লোকেরা যখন আল্লাহ সম্পর্কে এই গ্রীক দার্শনিকদের রচনাবলীকে নবী ও রসূলগণের শিক্ষার সাথে তুলনা করে তখন সত্যিই মনে হয় যেন তারা কর্মকারদের সাথে ফেরেশতাদের এবং সারা বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রভুর সাথে গ্রামের জমিদারের তুলনা করছে। এখানে তবুওতো তুলনা করার কোনো না কোনো পর্যায় থাকতে পারে। কিন্তু যারা দার্শনিকদেরকে নবীদের সাথে তুলনা করে তারা যেমন জালেম তেমনি মূর্খ। কারণ গ্রামের জমিদার তবুও তো গ্রামের শাসন শৃংখলা রক্ষার কাজ করে থাকে। এদিক থেকে মহাপ্রভু ও বিশ্ব

জাহানের বাদশাহর সাথে তার আংশিক সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু দার্শনিক ও নবীদের ব্যাপারটি হচ্ছে সম্পূর্ণ খাপছাড়া। নবীরা যে জ্ঞান লাভ করেন দার্শনিকরা তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেন না। বরং বলা যায়, কাফের, মুশরিক ও ইহুদিরাও আল্লাহ্ সম্পর্কে এ দার্শনিকদের চাইতে অনেক বেশি জানে।'

গ্রীক দার্শনিকদের এ অজ্ঞতার কারণ কি? এর কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হয়। ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে গ্রীক জাতিকে দেখা যায় মূর্তি ও নক্ষত্র পূজারী হিসেবে। এ সময় তাদের জাতীয় চিন্তাধারা অতি কল্পনাবাদ, ভাববাদ ও পৌরাণিকতাবাদে আচ্ছন্ন ছিল। আধুনিক ইতিহাস বিশ্লেষণে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচীন গ্রীসের সর্বত্র মূর্তি পূজা ও নক্ষত্র পূজার প্রচলন ছিল। দেশের সর্বত্র দেব-দেবীর মন্দির গড়ে উঠেছিল। দেবতাদের হাজার হাজার নাম মানুষের মুখে মুখে ছিল। যে গ্রীক দর্শন অনুদিত হয়ে ইসলামী বিশ্বের লাইব্রেরীগুলো অলংকৃত করেছিল এবং তারপর মুসলমানদের মাধ্যমে ইউরোপে পৌছেছিল তা আসলে এই মূর্তি পূজা ও নক্ষত্র পূজার রঙে আপাদমস্তক রঞ্জিত ছিল। গ্রীক দার্শনিকগণ তাদের এই মুশরিকী চিন্তাকে দর্শনের মুখরোচক পারিভাষিক শব্দমালায় সুসজ্জিত করেন। মুসলিম আলেম ও পণ্ডিতগণ গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস ও গ্রীক দার্শনিকদের ধর্মীয় চিন্তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার কারণে তাদের এ দার্শনিক আলোচনাগুলোকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান মনে করে নিজেরা এ নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন। এগুলোকে সত্য ও যথার্থ প্রমাণ করার জন্য তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা নিয়োগ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া কিন্তু এ গ্রীক দর্শনের গোড়ায় পৌছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সূরা ইখলাসের তাফসির প্রসঙ্গে লিখছেন ঃ

'গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিকদের সম্পর্কে যত দূর জানা যায়, তারা ছিলেন কট্টর মুশরিক। যাদূর প্রতিও তাদের আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। তারা নক্ষত্র ও মূর্তি পূজা করতো। জ্যোতিবিদ্যা ও নক্ষত্র মণ্ডলী সম্পর্কে তাদের গভীর আগ্রহের মূলেও এটি কাজ করেছে।....'

মুসলমানদের মধ্যেও যারা এদের দর্শনের অনুসারী হয়েছে তারাও মানুষকে শেরক করতে বাধা দেয় না এবং তওহীদকে অপরিহার্য মনে করে না। বরং শেরককে জায়েজ গণ্য করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে আরাস্তুর (এরিষ্টটল) পূর্ববর্তীগণ অদৃশ্য জ্ঞান যেমন আল্লাহ, ফেরেশতা, আখেরাত প্রভৃতি এবং দীনী তত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞাত ছিলেন এবং তারা ইসলাম ও আল্লাহর সত্য দীনের নিকটবর্তী ছিলেন। এর বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেছেন যে, আরাস্তুর পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যেমন পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লুটো-এরা গ্রীসের বাইরে বের হয়েছেন এবং সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন, যেখানে বিভিন্ন নবীর জন্ম

হয়েছে। তারা হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলায়মান আ.-এর সাহাবী ও অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাদের থেকে অদৃশ্য জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। কিন্তু আরাস্তুর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তিনি কখনো ঐসব দেশ সফর করেননি। তার কাছে নবীদের শিক্ষার কোনো অংশও ছিল না। তার জাতি নক্ষত্র পূজা করতো। এ সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান তার কাছে ছিল। এর ওপরই তিনি নিজের চিন্তা গবেষণার বুনিয়াদ রাখেন। পরবর্তীকালে তার অনুসারীরা চোখ বন্ধ করে তার পথে হেঁটে চলেন।

দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী বিশ্বে এই আরাস্তুর দর্শনেরই প্রচলন হয়। ফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, সোহরাওয়ার্দি প্রমুখ মুসলিম দার্শনিকগণ এই দর্শনের চর্চা করেন। তারা আরাস্তর নাম দেন 'মুআল্লিমে আউয়াল' বা প্রথম শিক্ষক।

মুসলিম দার্শনিকদের বিভ্রান্তির জবাবে যে ইলমে কালামের উদ্ভব হয় তার বক্তব্য উপস্থাপন পদ্ধতিতেও ইমাম ইবনে তাইমিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইমামের মতে দীনী ও অদৃশ্য সত্যগুলো প্রমাণ করার জন্য কালাম শাস্ত্রবিদরা দর্শনের পরিভাষা ও দর্শনের বক্তব্য প্রমাণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আর এ পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বরং বহুক্ষেত্রে তা বুমেরাং হয়ে ইসলামের ক্ষতিসাধন করেছে। তিনি বহু মূতাকাল্লিমের (কালাম শাস্ত্রবিদ) দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের বিরুদ্ধে বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সংশয়গুলোকে বেশ জোরালো পদ্ধতিতে পেশ করেন। কিন্তু তাদের জবাবগুলো হয় তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল ও নরম। তিনি ইমাম রাযীর রা. উল্লেখ করে 'আন নবুওয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইমাম রাযী শেষ বয়সে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালামী পদ্ধতি ও দার্শনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়ার ওপর অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এর ফলে কোন রোগীর রোগ নিরাময় হয় না, কোনো পিপাসার্তের তৃষ্ণা মেটে না। তিনি বলেন, কুরআনের পদ্ধতিকেই আমি নিকটতর পেয়েছি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন, তার মোকাবিলায় কুরআন মজীদের যুক্তি প্রমাণ অনেক বেশি সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। এছাড়াও দার্শনিক ও কালামীগণ তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে যে নতুন জটিলতা ও সংশয়ের সৃষ্টি করেন কুরআনী পদ্ধতিতে তারও কোনো অবকাশ থাকে না।

খৃষ্টবাদীদের জবাব

ইমাম ইবনে তাইমিয়া হিজরী অষ্টম শতকে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। নবুওয়াতের সাতশ' বছর পর ইসলামের

নিশানবরদারদের মধ্যে যে স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা নেহাত কম ছিল না। দু'শ' বছরের ক্রুসেড যুদ্ধ, তারপর তাতারীদের আক্রমণ তাদেরকে একেবারে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। এই সুযোগে এবং মুসলমানদের এ দুর্বল মুহূর্তে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদগুলো তাদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। বিশেষ করে খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টীয় মতবাদ এ সময় তাতারীদের বিজয়কে নিজেদের বিজয়রূপে চিহ্নিত করতে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা তাতারীদের হাতে মুসলমানদের একটি শহরের পতনে শহরের খৃষ্টান অধিবাসীদের উল্লাস এবং তাদের ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ করেছি। এসব কারণে এ সময় মুসলমানদের সামনে খৃষ্টীয় মতবাদ বেশ জোরালোভাবে উত্থিত হচ্ছিল। এর ফলে অনেক মুসলমানের ঈমান ও আমলের প্রাচীরে ফাটল ধরতে শুরু করেছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া যথাসময়ে মুসলমানদের এ রোগ নিরাময়ের অভিযান শুরু করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এ সম্পর্কিত অজস্র প্রসংগ ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি তিনি এর ওপর চার খণ্ডে ১৩৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'আল জওয়াবুস সহী লিমান বাদ্দালা দীনাল মসীহ' (যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্ম বিকৃত করেছে তাদের যথার্থ জবাব)।

আসলে এ সময় ইসলামী দেশগুলোয় বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়ায় বিপুল সংখ্যক খৃষ্টানদের বসবাস ছিল। আর সিরিয়ার পরই ছিল খৃষ্টান দেশগুলোর সিলসিলা। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল সিরিয়ার লাগোয়া। হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ থেকে ইউরোপীয়রা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ওপর হামলার যে সিলসিলা শুরু করে এবং পরবর্তী দুশো বছর পর্যন্ত যা অব্যাহত থাকে তার ফলে সিরিয়ার একটি অংশ মুসলমানদের দখলচ্যুত হয়। এই সংগে ৯০ বছর পর্যন্ত বায়তুল মাকদিস খৃষ্টানদের কবজায় থাকে। পরে অবশ্য সুলতান সালাহ উদ্দীন আইউবী হিত্তীনের যুদ্ধে ক্রুসেড বাহিনীকে বিপুলভাবে পর্যুদস্ত করে বায়তুল মাকদিস উদ্ধার করেন। কিন্তু এরপরও সিরিয়ার উপকুলে খৃষ্টানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার পর খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ও শাসকদের হিম্মত অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তারা সমগ্র সিরিয়াকে খৃষ্টধর্মের পতাকাতলে আনার এবং সমগ্র এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের স্বপ্ন দেখছিলেন। ঠিক এ সময়ই তাতারীদের হাতে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয়কে তারা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে তাদের জন্য সৃষ্ট বিরাট সুযোগ মনে করতে থাকে। এটাকে তারা নিজেদের বিজয়ের পূর্বাভাস মনে করে সর্বত্র এ আওয়াজ বুলন্দ করতে থাকে যে, যীশুর ধর্মই হচ্ছে সত্য ধর্ম এবং এই সত্য ধর্মই এবার বিজয় লাভ করেছে।

এ সময় খৃষ্ট জগত থেকে ইসলাম বিরোধী বইপত্রের আমদানী হতে থাকে বিপুলভাবে। এসব বইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াবার এবং খৃষ্ট ধর্মকে আল্লাহর একমাত্র সত্য ধর্ম প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালানো

হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ব্যাপকভাবে এই ফিতনার মোকাবেলা করেন। ইতিপূর্বে অনেক মুসলিম আলেম, গবেষক ও সমালোচক খৃষ্টধর্মের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্মের ইতিহাসের সাথে সঠিকভাবে পরিচিত ছিলেন না। তারা খৃষ্টধর্মকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা ও তাঁর সম্পর্কিত ঘটনার সমষ্টি মনে করে তাকে আসমানী বা খোদায়ী ধর্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে খৃষ্টধর্ম মুসলমানদের কাছে যতটুকু গুরুত্ব লাভের অধিকারী ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এ অবস্থা মানসিক ব্যাধি পীড়িত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল।

কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া খৃষ্টধর্মের ইতিহাস এবং রোম ও গ্রীস দেশে এর ধর্মদেহে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও অপারেশন এবং সেখানে এর যে প্রাথমিক বিকাশ হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন যে, সমকালীন খৃষ্টধর্ম আসলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা এবং রোমীয় ও গ্রীকদের মুশরিকী আকিদা, বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও পৌরাণিক দেবী-দেবতাদের কার্যকলাপের একটি সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আল জওয়াবুস সহী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা আসলে ছিল মুশরিক ও মূর্তি পূজারী। তারা হাইকেল ও ঠাকুর দেবতার মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো।' ......খৃষ্টানরা দুটি ধর্ম মিলিয়ে একটি ধর্ম বানিয়েছে। একটি হচ্ছে তওহীদবাদী নবীদের ধর্ম এবং অন্যটি মুশরিকদের ধর্ম। তাদের ধর্মের একটি অংশ নবীদের শিক্ষা এবং অন্য অংশটি মুশরিকদের ধর্ম থেকে গৃহীত কথা ও কর্মের সমষ্টি। এভাবে তারা একটি নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে, নবীদের কালামে যার কোনো সন্ধানই পওয়া যায় না।

এভাবে তিনি খৃষ্টধর্মের বিবর্তন ও বিকৃতির বিভিন্ন যুগ ও স্তর নির্দেশ করেন। এই সংগে ইনজিল সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণাও সুস্পষ্ট করেন। অনেক মুসলিম আলেম ইন্‌জিলকে কুরআন মজীদের সমপর্যায়ের আল্লাহর কিতাব মনে করে ভুল করেন। ফলে ঈয়ায়ী মুবাল্লিগদের প্রপাগাণ্ডায় তারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাই এ সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যে ইনজিল আজ খৃষ্টানদের হাতে আছে সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই স্বীকার করেন যে এটা হযরত ঈসার আ. সময়ে বা তাঁর নির্দেশে লেখা হয়নি। হযরত ঈসার আকাশে উঠে যাওয়ার পর তাঁর দু'জন হাওয়ারী (সাহাবী) মথি ও যোহন এবং হযরত ঈসাকে আ. দেখেননি এমন আরো দু'জন (মার্ক ও লুক) ঈসায়ী মিলে গ্রন্থটি লেখেন।[১] তিনি এও বলেন, মুসলমানদের কাছে রসূলের বাণী, কার্যকলাপ, দীন ও আকায়েদ যেমন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সিলসিলার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে ইনজিল ও তওরাতের বাণীকে

---

১. মথি ও যোহান হযরত ঈসার (আ) সাহাবী ছিলেন কিনা এ সম্পর্কেও আজ প্রশ্ন উঠেছে। দেখুন ফরাসী নও মুসলিম ডাঃ মরিস বুকাইলির গ্রন্থ 'কুরআন বাইবেল ও বিজ্ঞান।'

ঠিক সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। কুরআন মজিদ এবং তওরাত ও ইনজিলের পার্থক্য বর্ণনা করে তিনি বলেছেন ঃ

'কুরআন মজীদের শব্দ ও অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় চলে এসেছে। এর ওপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে রসূলের সুন্নাত এবং তাঁর অবস্থা ও ঘটনাবলীও। এগুলোর নির্ভুলতা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে।'

'...কুরআন মজীদ মুসলমানদের সিনায় সংরক্ষিত রয়েছে। কুরআন মুখস্থ করার জন্য কোন লিখিত ও মুদ্রিত বই পড়ার শর্ত নেই। খোদা না খাস্তা বইগুলো কোনদিন ধ্বংস হয়ে গেলেও কুরআন মুখস্থ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে হবে না। বিপরীত পক্ষে আজ বাইবেল গ্রন্থটি যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ঈসায়ীদের কাছে এর শব্দগুলোর কোনো বিকল্প স্টক নেই। এ জন্য এ ধরনের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যুগের পর যুগ নানান পরিবর্তন (শাব্দিক ও অর্থগত) সাধিত হচ্ছে।'

ঈসায়ীরা তাদের ধর্মের মধ্যে যে, বিকৃতি সাধন করেছে তার একটা বড় কারণ হিসেবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এও উল্লেখ করেছেন যে, ঈসায়ীরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের অনেক কথার সঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। ফলে তারা অনেক শব্দের আসল অর্থের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছে। এ ব্যাপারে ইহুদীরা ঈসায়ীদের চাইতে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে। তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন যে, আসমানী কিতাবগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন এবং সেখান থেকে নির্ভুল শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে নবীদের কথা, ইংগিত ও পরিভাষা বুঝা একান্ত অপরিহার্য। যেমন ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদার পুত্র বলার ব্যাপারটা। হাওয়ারীরা বলেন, হযরত মসীহ তাদের বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের মাবুদ। তাওরাতে সমস্ত বনী ইসরাইলকে খোদার পুত্র বলা হয়েছে। মিসরবাসীদেরকে ফেরাউনের পুত্র বলা হয়েছে। এর চাইতেও আরো অগ্রসর হয়ে পশুর বাচ্চাদেরকে পশু মালিকের বাচ্চা বলা হয়েছে। তাই বলে কি তারা সত্যিই পশু মালিকের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান হয়ে গেছে? ঈসায়ীদের এসব ভ্রান্তি ইমাম ইবনে তাইমিয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃষ্টানদের পর মুসলমানদের অন্তরগত যেসব চরমপন্থী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন তার মধ্যে শিয়াদের নামকে শীর্ষে রাখা যেতে পারে। শিয়াদের চরমপন্থী আকায়েদ ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তিনি একটি পৃথক বই লেখেন। আসলে সমকালীন তাতারী আক্রমণ ও ক্রুসেড যুদ্ধে বিধ্বস্ত মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে চরমপন্থী শিয়াদের আগ্রাসী প্রচারণা বিপুল

নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মুসলিম মিল্লাতকে এহেন নৈরাজ্য থেকে উদ্ধার করাই ছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার লক্ষ্য।

এখানে শিয়া প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কার্যক্রম আলোচনার পূর্বে পাঠকবর্গকে শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও তাদের আকায়েদ সম্পর্কে কিছু জানানো প্রয়োজন। খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের অবসানের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে যে মতবিরোধ, হাংগামা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয় আমলের বিস্তৃত পরিসরে যার জের চলতে থাকে পুরোদমে, তার মধ্যে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ফিতনা। এ ফিতনাগুলোর মূলে ছিল চারটি বড় বড় ফিতনা ঃ শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাজিলা– এই চারটি মূল ফিতনার উৎস থেকেই পরবর্তীকালের সমস্ত ফিতনার জন্ম।

শিয়া অর্থ হচ্ছে দল। শীয়ার বহুবচন শীয়াআন। প্রথম দিকে হযরত আলীর রা. সমর্থকবৃন্দকে 'শীয়াআনে আলী' বলা হতো। পরবর্তীকালে পারিভাষিক অর্থে তাদের শিয়া বলা হতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বনি হাশেমের কিছু লোক এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবাও হযরত আলীকে রা. খিলাফতের জন্য সবচেয়ে যোগ্য মনে করতেন। আবার কেউ কেউ অন্যান্য সাহাবাদের বিশেষ করে হযরত উসমানের রা. চাইতে তাঁকে বেশি যোগ্য মনে করতেন। অনেকে কেবলমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেই তাঁকে খিলাফতের হকদার মনে করতেন। কিন্তু হযরত উসমানের রা. খিলাফত আমল পর্যন্ত এ চিন্তাগুলো নিছক চিন্তা ও ধারণার পর্যায়ভুক্ত ছিল। তখনো পর্যন্ত এগুলো কোনো মতবাদ বা আকীদার রূপ গ্রহণ করেনি।

যে সব লোক এ ধরনের চিন্তা ও ধারণা পোষণ করতেন তারা সবাই হযরত উসমান রা. সহ পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার খিলাফত স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের হাতে বাইআতও করেছিলেন। তাঁদের কোনো কাজের প্রতিবাদও তারা করেননি।

কিন্তু এ বিশেষ চিন্তাগুলো একটা মতবাদ ও আকীদার রূপ নেয় হযরত আলীর রা. সাথে হযরত তাল্‌হা রা. ও হযরত যুবাইরের রা. জামাল যুদ্ধ, হযরত মুআবিয়ার রা. সিফ্‌ফীন যুদ্ধ ও খারেজীদের নাহরাওয়ান যুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে। তারপর কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হুসাইনের রা. মর্মন্তুদ শাহাদত লাভ এ চিন্তানুসারীদেরকে একত্রিত ও একটি দলের রূপে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই সংগে খিলাফতের পরপরই বনি উমাইয়াদের বিশেষ ধরনের রাজতান্ত্রিক শাসন ও জুলুমতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে

সাধারণ মুসলমানদের মনে তাদের বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুন জ্বলতে থাকে এবং এর পরই বনি আব্বাসদের আমলে হযরত আলীর রা. বংশধর ও তাঁর সমর্থকদের ওপর যে অমানুষিক জুলুম নির্যাতন চালানো হয় তার ফলে সাধারণ মুসলমানদের মনে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের ভাবধারা জেগে ওঠে। এসবগুলো পূর্বোল্লিখিত দলটিকে মজবুতভাবে শিকড় গাড়ার ও দলগতভাবে শক্তিশালী হবার সুযোগ দান করে। কুফা ছিল এ দলটির শক্তিশালী কেন্দ্র। আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দমা' এবং আবদুল করীম শাহরিস্তানী তাঁর 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে শিয়াদের বিশেষ মতবাদ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ হলোঃ

এক. ইমামতের (শিয়ারা খিলাফত স্বীকার করে না, তার পরিবর্তে তারা ইমামতের পরিভাষা গ্রহণ করেছে) ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। কাজেই সাধারণ মুসলমানদের ওপর ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পন করা যেতে পারে না। আর সাধারণ মুসলমানরা কাউকে ইমাম নির্বাচন করলেও সে ইমাম হয়ে যাবে না। ইমামত হচ্ছে দীনের একটি রুকন এবং ইসলামের আসল বুনিয়াদ। এ ব্যাপারে নবী নিজে কোনো প্রকার গাফলতি করতে পারেন না। উম্মতের উপর ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি চলে যেতে পারেন না। বরং তিনি নিজে ইমাম নির্বাচন করে যাবেন।

দুই. ইমাম হবেন মাসূম অর্থাৎ সমস্ত গুণাহ ও পাপের কালিমামুক্ত। ছোট বড় সব রকমের গুণাহ থেকে তিনি সংরক্ষিত থাকবেন। তার কোনো ভুল হবে না। তিনি যা কিছু বলবেন ও করবেন সবকিছু হবে হক–নির্ভেজাল সত্যের প্রকাশ।

তিন. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালল্লাম হযরত আলীকে নিজের পরে ইমাম নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।

চার. প্রত্যেক ইমামের পর পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত হবেন পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশে। কারণ এ দায়িত্ব সমগ্র উম্মতের কাছ থেকে নিয়ে একমাত্র ইমামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

পাঁচ. শিয়াদের সমস্ত ফেরকা এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, হযরত আলীর রা. আওলাদ ও বংশধররাই ইমামতের একমাত্র হকদার।

উপরের মতবাদগুলো প্রণয়ন করার ব্যাপারে শিয়ারা এক ধরনের হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যেগুলোর প্রণেতা তারা নিজেরাই। তারা নিজেরাই এগুলো রেওয়ায়েত করেছে এবং নিজেদের মযহাব অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা করে নিয়েছে। সাধারণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ হাদীসগুলো সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও জানেনা। বরং ইবনে খালদুনের ভাষায় বলা যায়, হাদিসগুলোর অধিকাংশই 'মওযু' অর্থাৎ মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল। এই হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীরা ত্রুটিমুক্ত নয়।

যাক আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে আসি। উপরোল্লিখিত মতবাদের ব্যাপারে অধিকাংশ শিয়া একমত হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে মতভেদের কারণে তারা আবার বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তবে তাদের মধ্যে বড় দল হচ্ছে, দু'টি ঃ ইমামিয়া ও যায়দীয়া। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আলীর ইমামত এবং তাঁর পর তাঁর আওলাদের ইমামতের সিলসিলার ওপর ঈমান রাখে তারা ফিরকা-ই-ইমামিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর যারা হযরত ফাতেমার রা. আওলাদের মধ্যে ইমামতকে সীমাবদ্ধ রাখে তাদেরকে বলা হয় যায়দীয়া। অর্থাৎ তারা এ মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করে।

সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে শিয়াদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত পোষণ করে। এদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ভারসাম্যপূর্ণ মতের অধিকারী শিয়াদের মতে হযরত আলী হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির সেরা। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং যারা তাঁর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তারা চিরকাল জাহান্নামে বাস করবে। কাফের ও মুনাফিকদের সাথে তাদের হাশর হবে। হযরত আলীর রা. পূর্বে আবু বকর রা. উমর রা. ও উসমান রা. কে খলিফা বানানো হয়েছিল। হযরত আলী রা. যদি তাদের খিলাফত মানতে অস্বীকার করতেন এবং তাদের প্রতি নিজের মানসিক অসন্তোষ প্রকাশ করতেন তাহলে এদের মতে তারাও জাহান্নামে বাস করতো (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু যেহেতু আলী রা. তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাদের হাতে বাইয়াত করেছেন এবং তাদের ইমামতিতে নামায পড়েছেন তাই তারাও হযরত আলীর কার্যক্রম অনুযায়ী এদেরকে মেনে নিয়েছে। তারা আলী ও নবীর মধ্যে নবুওয়াতের মর্যাদা ছাড়া আর কোনো পার্থক্য করতে প্রস্তুত নয়। অন্য সব ক্ষেত্রে আলী ও নবী সমান মর্যাদা সম্পন্ন।

এতো ছিল ভারসাম্যপূর্ণ শিয়াদের মত। আর এর মোকাবিলায় চরমপন্থী শিয়াদের অভিমত ছিল, হযরত আলীর আগে যেসব খলীফা খিলাফত গ্রহণ করেছিলেন তারা ছিলেন 'গাসেব'-আত্মসাতকারী ও খেয়ানতকারী। আর যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছিল তারা ছিল গোমরাহ ও জালেম। কারণ তারা নবীর অসিয়াত অস্বীকার করেছে এবং সত্য ও যথার্থ ইমামকে তার হক থেকে বঞ্চিত করেছে। এদের একদল আবার আরো একটু বেশি অগ্রসর হয়ে প্রথম তিন খলিফা ও তাদের নির্বাচনকারীদেরকে কাফের আখ্যা দেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে নরমপন্থী হলো যায়দীয়ারা। তারা হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠ বলে। কিন্তু তাদের মতে শ্রেষ্ঠের বর্তমানে অশ্রেষ্ঠরাও ইমাম হতে পারে। এছাড়াও তারা মনে করে, হযরত আলীর ইমামতির পক্ষে রসূলুল্লাহ স. এর সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। তাই তারা আবু বকর ও উমরের খিলাফত স্বীকার করে। তবুও তাদের মতে ফাতেমার আওলাদ থেকেই ইমাম নিযুক্ত হতে হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহে আলাইহি তাঁর রচনাবলীর বিভিন্ন স্থানে শিয়াদের এই সমস্ত আকিদা-বিশ্বাস ও কার্যক্রমের প্রতিবাদ করেছেন। আর অন্য দিকে সুন্নাত ও আহলে সুন্নাতের আকীদা বিশ্বাস এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর যুগে শিয়াবাদ যেভাবে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে এবং তা মুসলমানদের মূল আকিদা বিশ্বাস ও রসূলের হাতে গড়া মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম দল আসহাবে রসূলের চরিত্রে যেভাবে কলংক আরোপ, তাদেরকে গালিগালাজ এবং তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক প্রতিবাদের তুফান সৃষ্টি করে, তা ইমামকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। তিনি মনে করেন, রসূলের হাতে গড়া মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম দলই যদি নিন্দিত হয় তাহলে মুসলমানদের সামনে আর কোনো মডেল থাকবে না। ফলে তারা চারিত্রিক নৈরাজ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে। আর বিশেষ করে সে সময়ের তাতারী বাদশাহ ওলিজা খুদাবান্দা খানের আশীর্বাদপুষ্ট শিয়া আলেম ইবনুল মোতাহার শিয়াবাদ ও ইমামতের সমর্থনে এবং খিলাফত ও আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে 'মিনহাজুল কিরামাহ ফি মা'রিফাতিল ইমামাহ' নামে যে বিরাট গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন তা মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিয়ারা এ গ্রন্থটি নিয়ে বেশ হৈ চৈ করতে থাকে এবং এর প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের কোনো জবাব দেয়া সম্ভব নয় বলে দাবী করে। এ গ্রন্থে হযরত আলী রা. ও আহলে বায়েতের ইমামত ও ইসমাতের (তথা মাসুমিয়াত- অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সকল প্রকার ভুল ও গুনাহ থেকে মুক্ত) প্রমাণ পেশ এবং তিনজন খলীফার খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাহাবায়ে কেরামের নিন্দা করা হয় এবং এ নিয়ে বিরাট আলোচনার আসর জমানো হয়। কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে এগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। সমগ্র গ্রন্থটি এমন তাত্বিক আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণে পূর্ণ ছিল যে, একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার বক্তব্যের বিরোধী মত পোষণ করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

অষ্টম শতকের শিয়া আলেমদের ন্যায় এ গ্রন্থকারও উসূল ও আকীদার দিক থেকে ছিলেন মুতাজিলা সম্প্রদায়ভূক্ত। ফলে আহলে সুন্নাতের আকীদা বিশ্বাসের ওপর তাঁর আক্রমণ চলে সম্পূর্ণ দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের কায়দায়। এজন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজেও এর প্রভাবে পড়ে।

এ ধরনের গ্রন্থের জবাব লেখা সাধারণ আলেম বা লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার দুর্ভাগ্যবশত সাধারণভাবে শিয়া আলেমগণ হাদীস তৈরি করার এবং এই তৈরি করা হাদীসের বরাত দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভীক প্রমাণিত হয়েছিলেন। এই সংগে হাদীস শাস্ত্র তখন অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছিল। লক্ষ লক্ষ হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছিল। এদের বিভিন্ন সংকলন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শহরের গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে ছিল। 'জারাহ' ও 'তাদীল' এবং 'আসমাউর রিজাল' তথা হাদীসের নির্ভুলতা ও

অকাট্যতা যাচাই করার ইল্‌মও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কোনো এক শহরের কোনো একটি গ্রন্থাগারে এগুলো একাট্টা ছিল না। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে উল্লেখিত গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলোর নির্ভুলতা যাচাই করা তাই এক্ষেত্রে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। এ কাজ একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভবপর ছিল যিনি ছিলেন হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের হাফেজ, হাদীসের প্রতিটি গ্রন্থ এবং রাবীদের নাম ও অবস্থা যার নখদর্পণে ছিল, প্রতিপক্ষ মিথ্যা বরাতের মাধ্যমে যাকে কোনো প্রকারে ধোকা দিতে পারতো না। এই সংগে ইসলামের ইতিহাসও যার সামনে ছিল উন্মুক্ত কিতাবের মতো। ইতিহাসের কোনো গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে যাকে নাকাল করাও সম্ভবপর ছিল না।

এ ধরনের একজন সর্বজ্ঞান সমন্বিত আলেম হিসেবে সে যুগে একমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নামই করা যেতে পারতো। দর্শন ও কালাম শাস্ত্রে তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন প্রতিপক্ষের দার্শনিক ও যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার গলদ নির্ণয় তাঁর পক্ষে যেমন সম্ভবপর ছিল তেমনি হাদীস শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সে যুগে তাঁকে হাদীসের বিশাল গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করা হতো। তাঁর সম্পর্কে তো বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিতই ছিল, 'ইমাম ইবনে তাইমিয়া যে হাদীসটির ব্যাপারে একথা বলেছেন যে, তিনি এটি জানেন না, সেটি আসলে কোন হাদীসই নয়।'

ইবনে মোতাহারের গ্রন্থের জবাবে ইবনে তাইমিয়া যে গ্রন্থটি লেখেন তার নাম, 'মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবীয়্যাতি ফী নাকযিল কালামিশ শীয়াতি ওয়াল কাদরীয়্যাহ'– অর্থাৎ শিয়া ও কাদরীয়াদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রসূলের সুন্নাতের পথ। গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে ১২১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

ইমাম তাঁর গ্রন্থে একথা প্রমাণ করেছেন যে, শিয়া আলেম ইবনে মোতাহার যেভাবে 'আফযালুল খালায়েকে বাদাল আম্বিয়া'–নবীদের পরে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন অর্থাৎ আসহাবে রসূলকে গালিগালাজ করেছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে দেখিয়েছেন তাতে তিনি ইসলামের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করেছেন বলা যায়। এর ফলে নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর ওপর আক্রমণ, এর সমালোচনা ও নাস্তিক্যবাদের দরজা খুলো যায়। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ 'এই শিয়ারা, নবী ও রসূলগণের পরে প্রথম ও শেষের সমস্ত উম্মতের মধ্যে যারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে সৎ তাদেরকে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম ও সব চাইতে অসৎ হিসেবে চিত্রিত করেছে। এদের বড় বড় দোষ বর্ণনা করেছে। এদের গুণগুলোকে দোষে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। আর এর মোকাবিলায় যেসব স্বার্থবাদী লোক নিছক স্বার্থোদ্ধারে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে জড়িত করে রেখেছিল। যাদের চাইতে বড় ফাসেক ফাজের মিথ্যুক, বেঈমান, জালেম এবং গুনাহ ও কুফরী কর্মে লিপ্ত লোক আর ছিল না তাদেরকে তারা সৎ ও সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমাণ করেছে। এভাবে তারা সমগ্র উম্মতের তাকফীর করেছে,

অথবা তাদেরকে গোমরাহ প্রমাণ করেছে—কেবলমাত্র নিজেদের ছোট্ট একটি দল ছাড়া, যাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস একমাত্র তারাই সত্যপন্থী।'

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের এক স্থানে তিনি ইমাম শা'বীর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন। তাতে ইমাম শাবী বলেছেন ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা শিয়াদের তুলনায় তাদের পয়গম্বরদের বেশি মর্যাদা দান করে। ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা? তারা জবাব দিল হযরত মুসার আ. সাথিরা। খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা? তারা জবাব দিল, হযরত ঈসার আ. হাওয়ারী অর্থাৎ সাথিগণ। আর শিয়াদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে নিকৃষ্টতম কারা? তারা জবাব দিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা। এ সদাচারী লোকদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামের জন্য দোয়া করার কিন্তু তারা তাদেরকে গালিগালাজ করেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের আর এক স্থানে শিয়াদের একটি অভ্যাস বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ 'শিয়াদের চিরন্তন অভ্যাস হচ্ছে তারা মুসলমানদের জামায়াত ছেড়ে হামেশা ইয়াহুদ, নাসারা ও মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের আলাপনী করে। তাদের চাইতে বড় গোমরাহ আর কে হতে পারে যারা মুহাজির ও আনসারদের প্রথম সারির লোকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে সখ্যতা রাখে?

তারপর বিভিন্ন জাতীয় সমস্যায় শিয়াদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে জাতীয় সংকটকালে কাফেরদের সাথে সহযোগিতা করার ঘটনাবলী উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তাদের অধিকাংশই মনে প্রাণে কাফেরদের সাথে সখ্যতা পোষণ করে মুসলমানদের মোকাবিলায় অনেক বেশি। কাজেই যখন তাতারীরা পূর্বদিক থেকে ইসলামী বিশ্বে অভিযান চালালো, মুসলমানদেরকে হত্যা করলো, খোরাসান, সিরিয়া, ইরাক ও জাযিরায় মুসলমানদের রক্তের নদী প্রবাহিত করলো, তখন এই শিয়ারা মুসলমানদের মোকাবিলায় তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী ছিল। এভাবে সিরিয়া, হালব (আলেপ্পো) প্রভৃতি এলাকায় যেসব শিয়া ছিল তারা দুশমনদের সহায়তা করলো। অনুরূপভাবে খৃস্টানরা যখন সিরিয়ায় মুসলমানদের সাথে লড়াই করলো তখন শিয়ারা ছিল তাদের সহায়ক। এভাবে দেখা যায়, যদি ইরাকে বা অন্য কোথাও ইয়াহুদীদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে শিয়ারা তাদের সবচাইতে বড় সহায়ক শক্তি প্রমাণিত হবে। তাই তারা সবসময় কাফের ও মুশরিক এবং ইয়াহুদ ও নাসারাদের সাহায্য করার এবং মুসলমানদের মোকাবিলায় তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য তৈরি থাকে।'

ইসলামী ইলম ও চিন্তার পুনরগঠন

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহে আলাইহি ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের গতিধারায় তিনি হক, ইনসাফ, ইলম ও মনীষার এমন এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মিল্লাতকে সত্য ও ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। নবুওয়াত ও খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়াতের অবসানের সাড়ে ছ'শ বছর পর তিনি ইসলাম ও মিল্লাতে ইসলামিয়াকে পুনর্বার নতুন জীবন রসে সমৃদ্ধ করেন। নবী যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকে না, কোন অসম্পূর্ণতা থাকে না। নবীর তিরোধানের পর চতুর্দিকের ময়লা আবর্জনা ইসলামকে ঘিরে ফেলে, ইসলাম ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে থাকে, আপতদৃষ্টিতে তার সম্পর্কে অসম্পূর্ণতার ধারণাও আসতে থাকে। এ সময় ইসলামের দেহ থেকে ময়লা আবর্জনা ঝেড়ে মুছে ফেলে যারা যথার্থ ইসলামকে আবার সুস্পষ্ট করেন এবং ইসলামের অসম্পূর্ণতার ধারণার মুলোৎপাটন করেন তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ আলেম এবং দীনের মুজাদ্দিদ। সত্য ও মিথ্যা তাদের কাছে সুস্পষ্ট থাকে যেমন দুপুরের সূর্য। এজন্য আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক বা জ্ঞানের কোন ডাইরেক্ট পাইপ লাইনের কথা বলছি না। কুরআন ও সুন্নাতই যথেষ্ট। সত্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের এ দু'টিই একমাত্র চ্যানেল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন এমনি একজন যথার্থ আলেম ও দীনের মুজাদ্দিদ। নবুওয়াতের সাতশ' বছর পর তিনি ইসলামকে আবার তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য ভিতর ও বাইরের সমস্ত আবর্জনা থেকে তাকে মুক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে ইমামের তিনটি তাজদীদী কাজের আলোচনা করেছি। তাঁর চতুর্থ তাজদীদী কাজটি ছিল শরীয়তের ইলম ও ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন।

ইমামের যুগ পর্যন্ত শরীয়তের ইলম যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছিল। বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ ও কালাম শাস্ত্র ভিত্তক বিরাট বিরাট পাঠাগার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর যে কোনো একটিতে পারদর্শিতা অর্জন সেযুগের একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর খ্যাতি লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবুও একাধিক শাস্ত্রে পণ্ডিত লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। শুধুমাত্র 'তাবকাতুশ শাফেইয়াতুল কুবরা' কিতাবটি পড়লে এমন অসংখ্য আলেমের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা একই সংগে শরীয়তের সমস্ত ইলমে পারদর্শী ছিলেন। তাদেরকে সেযুগের শরীয়তের ইলমের ইনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। কিন্তু শরীয়তের ইলমের এই বিপুল চর্চা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও ইলমের গভীরতা অতি অল্প আলেমরই ছিল। এই অল্প সংখ্যকদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নাম ছিল শীর্ষে।

ইমামের স্মৃতিশক্তি ছিল নজিরবিহীন। যার ফলে সব ধরনের ইল্‌মে পারদর্শিতা অর্জন তার পক্ষে হয়েছিল অত্যন্ত সহজসাধ্য। এই সঙ্গে আল্লাহ্ প্রদত্ত

তীক্ষ্ণ মেধার কারণে তিনি প্রত্যেক জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি যে বিষয়ে লিখতেন সে বিষয়ের কোন না কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতেন। বিশেষ করে তিনি কুরআন মজীদ ও শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করার এক নতুন পথ খুলে দেন। কুরআনের তাফসীর তাঁর একটি বিশেষ ও সবচাইতে প্রিয় আলোচনার বিষয়। তার এমন কোনো গ্রন্থ নেই যেখানে কুরআনের তাফসীরের বিষয়বস্তু নেই। কুরআনের আয়াতের বিস্তারিত আলোচনার পর সেখান থেকে যুক্তি প্রমাণ গ্রহণ করেননি এমন কোনো গ্রন্থই তার পাওয়া যাবে না। তাঁর শাগরিদবৃন্দের মতে তিনি তাফসীর সংক্রান্ত যেসব আলোচনা রেখে গেছেন তা সব একত্রিত করলে ৩০ খণ্ডে কুরআনের একটি তাফসীর সমাপ্ত হতে পারে। কিন্তু বিচিত্র ঘটনা বহুল সংগ্রামী ও সার্বক্ষণিক জিহাদী জীবন-যাপন করার ফলে তাঁর সব পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয়নি। তবুও গুণীজনদের প্রচেষ্টায় তাঁর তাফসীর সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত হয়ে গেছে। তার মধ্যে সূরা নূর, সূরা ইখলাস ও সূরা মুআওবিযাতাইনের তাফসীর মিসর থেকে ছাপা হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে তাঁর বিভিন্ন কিতাব থেকে তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনাগুলো একত্রিত করে তাফসীরে ইবনে তাইমিয়া নাম দিয়ে বোম্বাই থেকে একটি বই ছাপা হয়েছে। তাফসীরের মূলনীতি সংক্রান্ত উসূলে তাফসীর নামে তাঁর একটি বইও পওয়া যায়। হাসীসের ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর যুগে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও হাদীসের ওপর তাঁর কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নেই। তবে উসূলে হাদীস, আসমাউর রিজাল জারাহ ও তা'দীল, নাকদে হাদীস, ফিকহে হাদীস প্রভৃতি আলোচনা তাঁর রচনায় এভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, তা সব একত্রিত করলে কয়েক খণ্ডে তাঁর একটি বিরাট রচনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। বিশেষ করে মওযু, মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট হাদীসের ব্যাপারে তাঁর কিতাবগুলোয় যে ধরনের গবেষণামূলক আলোচনা পাওয়া যায় তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে শিয়াদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থটিতে সবচাইতে বেশি আলোচনা পাওয়া যাবে।

উসূলে ফিক্‌হের উপরও তার আলোচনা কম নেই। এক্ষেত্রে তিনি একজন মুজতাহিদের মর্যাদার অধিকারী। মূলগতভাবে তিনি নিজে হাম্বলী ফিক্‌হের অনুসারী হলেও নিজের স্বাধীন রায় প্রকাশের ব্যাপারে মোটেই কার্পণ্য করেননি। এ ব্যাপারে তার 'ফাতাওয়া-ই-ইবনে তাইমিয়া' ও 'ইকতিযাউ সিরাতিম মুসতাকীম' কিতাবের নাম করা যেতে পারে। উসূলে ফিক্‌হের ওপর তাঁর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হচ্ছে 'মিনহাজুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল।'

ইলমে কালাম সংক্রান্ত ইমামের রচনাবলী একত্রিত করলে দেখা যাবে ইলমে কালাম ও আকায়েদ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর শতকরা চল্লিশ ভাগ অংগন জুড়ে

আছে। এ সংক্রান্ত তাঁর কিতাবগুলোর নামের ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট দেখা যায়। কিতাবগুলোর নাম বিভিন্ন শহরের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ যেসব শহর থেকে প্রশ্ন এসেছিল সেইসব শহরের নামে বইগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন 'শারহে ইসবানিয়া (ইস্পাহান), রিসালায়ে হামাভীয়া, তাদমীরিয়া, ওয়াসিতীয়া, কাইলামিয়া, বাগদাদীয়া আযহারীয়া' ইত্যাদি। ইলমে কালাম সংক্রান্ত ইমামের গ্রন্থগুলো পড়লে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপকতার সন্ধান পাওয়া যাবে।

ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান একজন মুজতাহিদের চাইতে কম নয়। যদিও তাঁর সময় পর্যন্ত সব মযহাবের ফিক্‌হ্ সংকলন ও বিন্যাসের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়েছিল তবুও সেক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি মুজতাহিদের দৃষ্টিতে ফিক্‌হের বিভিন্ন মাসায়েল ও আহকাম পর্যালোচনা করেন এবং কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রসূল, ইজমা, কিয়াস ও উসূলে ফিক্‌হের আলোকে আহকাম বিশ্লেষণ করে ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতও করেছেন। ফিক্‌হ ও হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও করেছেন। ফিক্‌হের রায় ও খুটিনাটি মাসায়েলকে সহী হাদীসের অনুসারী করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর ফতওয়ার বিরাট বিরাট কিতাব রয়ে গেছে। এ গ্রন্থগুলো বহুখণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। সম্প্রতি মিসর থেকে ১৫৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ৪ খণ্ডে ফতওয়ায়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সৌদী সরকার ৩০ খণ্ডে তাঁর ফতওয়াগুলোর বৃহত্তম সংকলন প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তীকালে কয়েকশ' বছর পর্যন্ত ইমামের ইল্‌ম সমগ্র ইসলামী বিশ্বে যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। এমনকি আজকের যুগেও তাঁর ইলমের প্রভাব মুক্ত কোনো শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের সন্ধান পাওয়া কঠিন।

দুনিয়ায় বহু চিন্তা ও মতবাদের প্রচলন রয়েছে। এগুলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধারণা, কল্পনা, যুক্তি, আন্দাজ, অনুমান, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান, আলোচনা ও বিতর্কের ভিত্তিতে। বিপরীতপক্ষে ইসলামী চিন্তা ও মতবাদের ভিত গড়ে উঠেছে অহী ও নবুওয়াতে মুহাম্মদীর ওপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর কার্যাবলী, বিশ্ব জাহানের সূচনা ও সমাপ্তি, দুনিয়ায় মানুষের প্রথম পদার্পণ ও তার পরিণাম, কিয়ামত, হাশর-নশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং দীনী জীবনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলী সম্পর্কে যা কিছু বলে দিয়েছেন তাই হচ্ছে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস-চিন্তা মতবাদ। নবীর ওপর আল্লাহর অহী ছাড়া এ বিষয়গুলো জানার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। চিন্তা-গবেষণা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছেও পৌছানো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোনো

অভিজ্ঞতাও নেই। এসব চোখে দেখাও যায় না। কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে ঃ 'লাইসা কামিসলিহী শাইউন'—কোন জিনিসের সাথে তাঁর সাদৃশ্য নেই। কাজেই এক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আর এ জ্ঞান একমাত্র নবীদের কাছেই পাওয়া যায়। নবীদের হৃদয় এ জ্ঞানের আলোকে এমন উদ্ভাসিত যেন তাঁরা সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের জ্ঞানের মধ্যে সংশয়ের কণামাত্রও নেই। তাই নবীদের জ্ঞানের ব্যাপারে সামান্যতম সংশয় প্রকাশেরও অবকাশ নেই। কুরআনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ- (الانعام . ٨٠)

'তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ আল্লাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।'

এটা এমন একটা ব্যাপার যা দুপুরের সূর্যটার মতোই সত্য ও সুস্পষ্ট। এ ধরনের প্রোজ্জ্বল সত্যের উপস্থিতিতে আর কোনো দর্শন এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী প্রমাণের জন্য আর কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির প্রয়োজনই নেই। তবুও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে এসবের বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। অথচ এ ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার মানুষ নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব বিষয়ের আলোচনার জন্য দার্শনিকরা নিজেদের তরফ থেকে কিছু পারিভাষিক শব্দ তৈরি করে নিয়েছেন। সেগুলোর অর্থ তারা নিজেরাই করেছেন। পরবর্তীকালে মুসলিম মুতাকাল্লিমগণ এই দার্শনিকদের বিভ্রান্তির জবাব দিতে গিয়ে তাদেরই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের শব্দগুলোর সীমিত অর্থের স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে তারা এমন নিশ্চয়তার সাথে আলোচনা চালিয়েছেন, যেন মনে হয় এসব তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দর্শন ও অনুভূতি লব্ধ। দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বের হয়ে তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে দার্শনিকদের দলে ভিড়ে পড়েছেন এবং দার্শনিকদের সমস্ত বাহাস ও বিতর্কের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কুরআন মজীদ কেমন চমৎকারভাবে দার্শনিকদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَ لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা কি শুনেছো? তোমরা তো এমন সব কথা নিয়ে বিতর্ক করেছো যার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিল সামান্য। তাহলে এখন আবার কেন বিতর্ক করছো

এমন সব কথা নিয়ে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।' (আল ইমরান ঃ ৬৬)

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সময়ে এবং তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকশো বছর থেকে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে স্থবিরবরতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে আল্লাহর সত্তা, তওহীদ, আখেরাত এবং অন্যান্য অদৃশ্য ও অতি প্রাকৃতিক সত্যগুলো প্রমাণ করার জন্য দার্শনিকদের গড়া ভিত্তির ওপর মুতাকাল্লিমগণ যে আকায়েদের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তাকেই দীনের আসল বুনিয়াদ মনে করা হতে থাকে। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের ছোট্ট একটি গোষ্ঠী বাদে বাকী সবাই মুতাকাল্লিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তকেই ইসলামী আকায়েদের মানদণ্ড মনে করতো। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে আকায়েদের মানদণ্ডে পরিণত করার পরিবর্তে মুতাকাল্লিমদের বইগুলোকেই তারা মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছিল। প্রশ্ন ও আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা আয়াত ও হাদীসের 'তাবীল' অর্থাৎ মনগড়া ব্যাখ্যা করতো। দর্শন ও ইলমে কালামের প্রভাব তাদের ওপর এমন ভাবে চেপে বসেছিল যে, তার মধ্যে কোন ভুল তারা কল্পনাও করতে পারতো না বরং কুরআন হাদীসকে কাটছাঁট করে সেই মোতাবেক করার চেষ্টা করতো।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি দর্শন, ইলমে কালাম ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আকায়েদ, চিন্তা ও মতবাদের ভিত্তি গড়ে তোলেন। [১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি বুদ্ধিকে অপ্রতিহত ও অসীম ক্ষমতা দান এবং আল্লাহ, রসূল ও পরকালের ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত দানকারী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান। সঠিক অর্থে এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম সার্থক প্রতিবাদকারী। বুদ্ধির অবিমৃশ্যকারিতার বিরুদ্ধে তিনিই সার্থক বিদ্রোহী।

ইতিপূর্বে ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহে আলাইহি দর্শনে বর্ণিত আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর বিরুদ্ধে লেখেন, এগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন এবং দার্শনিকদের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে বেশ জমিয়ে রসিকতা করেন। কিন্তু বুদ্ধির অসীম ক্ষমতা এবং যে বিষয়ে তার সঠিক জ্ঞান নেই সে বিষয়ে গভীর তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তিনি কোন শক্তিশালী আওয়াজ বুলন্দ করেননি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের শক্তি ব্যবহার করে একথা প্রমাণ কারার চেষ্ট করেছেন যে, আকীদা-বিশ্বাস ও অদৃশ্য সত্যগুলোর মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহর অহী, যাকে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের মধ্য

১. সম্প্রতিকালে এই দৃষ্টিভংগিতে সবচেয়ে সার্থক ইসলামী আকায়েদ গ্রন্থ রচনা করেছেন মিসরের মুহাম্মদ আল গাযালী। তাঁর গ্রন্থটির নাম ঃ আকীদাতুল মুসলিম। বইটি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে বাংলায় 'ইসলামী আকীদা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

থেকে আরহণ করা হয়। বুদ্ধি এর শক্তি বৃদ্ধি ও এর সত্যতা প্রমাণের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এর প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। তিনি 'সারীহুল মাকুল লিসাহীহিল মানকুল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন ঃ

'শরীয়তকে প্রমাণ করার জন্য বুদ্ধি আসলে কোন ভিত্তির কাজ করতে পারে না। তাকে এমন কোন গুণে গুণান্বিত করা হয়নি যার অধিকারী সে আগে ছিল না। আর পূর্ণতার গুণেও তাকে ভূষিত করা হয়নি।'

তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, বুদ্ধি কেবল একজন পরিচিতি উদ্‌ঘাটনকারী ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। রসূলের সত্যতা ও নিষ্কলুষতার স্বীকৃতি পর্যন্তই সে মানুষকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে মাত্র। এরপর তার আর কোন ক্ষমতা নেই। বুদ্ধি এটা প্রমাণ করতে পারে যে, রসূল যেসব বিষয়ের খবর দিচ্ছেন সেগুলো সত্য এবং তিনি যে হুকুমগুলো দিয়েছেন সেগুলো পালন করা ওয়াজিব। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ঃ এক শহরে একজন আগন্তুক এলো। সে শহরের মুফতির সন্ধান করলো। একজন সাধারণ শহরবাসী তাকে মুফতির ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো এবং মুফতি সাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, ইনিই শহরের মুফতি ও আলেম। এরপর ঐ সাধারণ শহরবাসীটি ও মুফতির মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে আগন্তুকের উচিত হবে মুফতির কথা ও সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া এবং এক্ষেত্রে সাধারণ শহরবাসীটির এই বলে চাপ দেয়ার কোনো অধিকার থাকে না যে, মুফতির কাছে সে পথ দেখিয়ে না আনলে আগন্তুক মুফতির সন্ধান পেতো না, কাজেই তার সিদ্ধান্তই তাকে মেনে নিতে হবে। ইমাম লিখেছেন, রিসালাত সম্পর্কে জানার পর বুদ্ধির কাজ হচ্ছে রসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাঁর আনুগত্য করা এবং কোন প্রশ্নজালে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম মেনে চলা। তাঁর কথাকে চূড়ান্ত মনে করা। এভাবে অদৃশ্য ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলী সম্পর্কেও রসূলের কথাকে চূড়ান্ত মনে করতে হবে। তার মতে আল্লাহর রসূলের মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের কোন মর্যাদাই নেই। রসূল হন সত্যবাদী। তাঁরা সব সময় নির্ভুল খবর পেয়ে থাকেন। তাঁদের খবর ও জ্ঞান সত্যের বিপরীত হবে একথা কল্পনাও করা যায় না। আর যেসব লোক নেহাত নিজেদের বুদ্ধির কসরত দেখিয়ে তাঁদের খবর ও জ্ঞানের মোকবিলা করে তাদের মুর্খতা ও ভুলের শেষ নেই।

দর্শন ও বুদ্ধিবাদিতায় প্রভাবিত লোকদের মানসিক গঠন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে তারা শরীয়তের যে কথাটি বুদ্ধি ও দর্শনের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হতো তাকে সহজেই গ্রহণ করে নিতো। কিন্তু যে কথাটি তাদের তৈরি যুক্তি ও বুদ্ধিবাদিতার

বিরোধী মনে হতো তাকে মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাদের মধ্যকার অতি সাহসীরা সরাসরি তা মেনে নিতে অস্বীকার করতো। তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো ঃ শরীয়ত অবশ্যই হবে বুদ্ধির অনুগামী। একথাটা বুদ্ধি বিরোধী। কাজেই এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা এতটা সাহসী নয় তারা শরীয়তের বক্তব্যের ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা করতে থাকতো। এমন এমন ব্যাখ্যা তারা আনতো যার সাথে শরীয়তের ঐ বক্তব্যের সামান্যতম মিলও থাকতো না। এইসব লোকের মানসিকতাকে সামনে রেখে ইমাম ইবনে তাইমিয়া একথা প্রকাশ করেছেন যে, রসূলের ওপর শর্তহীন ঈমান আনা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। শর্তসাপেক্ষে রসূলের ওপর ঈমান আনাকে কোনক্রমেই ঈমান বলা যেতে পারে না। তিনি লিখেছেন ঃ 'ইসলামের ব্যাপারে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূলের সত্যতার স্বীকৃতি দান ও তাঁর ওপর এমন পর্যায়ের ঈমান আনা ওয়াজিব, যা চূড়ান্ত ও সর্বব্যাপী, যার সাথে কোন শর্ত থাকবে না। তাঁর প্রত্যেকটি খবরকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুমের আনুগত্য করতে হবে। এর বিরোধী যে কোন কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি রসূলের এমন সব কথাকে সত্য বলে মেনে নেয় যেগুলো তাঁর বুদ্ধির সীমার মধ্যে আসে আর এমন সব কথাকে অস্বীকার করে যা তার নিজের মত ও বুদ্ধি বিরোধী এবং রসূলের খবরের ওপর নিজের বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয় আবার এই সংগে রসূলকে সত্য বলে মেনে নেয়ার দাবীও করতে থাকে, সে আসলে পরস্পর বিরোধী কথা বলে, সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সে মুলহিদ–আল্লাহ ও রসূলের বিরোধী। আর যে ব্যক্তি বলে রসূলের কোন কথাকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তাকে বুঝে না নেয়া পর্যন্ত আমি তাকে সত্য বলতে রাজী নই, তার কুফরীতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বুদ্ধির দাবীদারদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, নবী-রসূলদের বাণীর বিরুদ্ধে এবং কুরআন ও সুন্নাহর উজ্জ্বল সত্যের মোকাবিলায় যেসব বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত খাড়া করা হয়, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নিছক কল্পনা ও ভাববিলাসিতা এবং গভীরভাবে চিন্তা করলে সেগুলো বুদ্ধির আকাশ-কুসুম কল্পনাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, দার্শনিকরা তাদের যে সব বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে গর্ব করে সেগুলোকে 'আল্লাহ তত্ব' নাম দিয়েছে এবং যেগুলোকে তারা নবীদের কালামের মোকাবিলায় পেশ করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে সেগুলোর এবং পাগলের প্রলাপের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাবে না।

কিন্তু ইমাম সাহেব বুদ্ধিকে তার যথার্থ মর্যাদা দিতে মোটেই কার্পণ্য করেননি। তাঁর মতে কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধি ব্যবহার করার এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার উপদেশ দেয়া হয়েছে। তার মতে নির্ভুল ও ভারসাম্যের

অধিকারী বুদ্ধি ও নবী রসূলদের নির্ভুল বাণীর মধ্যে কোন বিরোধ হতে পারে না। তিনি নিজের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়নের ফল বর্ণনা করে বলেছেন, বুদ্ধি ও রসূলের বাণীর মধ্যে আমি কোনো বিরোধ দেখিনি। তবে শর্ত হচ্ছে, বুদ্ধি হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ, যাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'আকলে সালীম' এবং নবীর বাণী হতে হবে সঠিকভাবে সংরক্ষিত, যার মধ্যে কোনো বিকৃতি হয়নি। এ বিষয়বস্তুর ওপর তিনি চার খণ্ডে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম হচ্ছে 'বায়ানু মাওয়াফিকাতে সারীহিল মাকুল লিসাহীহিল মানকুল'। এ কিতাবে তিনি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, যুক্তিসংগত নির্ভুল বুদ্ধিবৃত্তি ও নবী রসূলদের অবিকৃত বাণীর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। নির্ভুল বুদ্ধিবৃত্তি সব সময়ই এ ধরনের বাণীর সত্যতা প্রমাণে সহায়তা করেছে।

তিনি গভীর নিষ্ঠার সাথে দাবী করেছেন, একটি হাদীসও বুদ্ধি বিরোধী নয়। আর যদি এমন কোন হাদীস থেকে থাকে তাহলে দেখা যাবে হাদীস বিশারদদের কাছে আগেই তা 'যঈফ' (দুর্বল) ও 'মওযু' (বানোয়াট) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের এ দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন যে কুরআনের ভিত্তি নিছক উদ্ধৃতি ও শ্রুতির ওপর। তিনি প্রমাণ করেছেন, কুরআনে সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণ ও বুদ্ধি বৃত্তিক আলোচনা রয়েছে। কুরআনের যুক্তি প্রমাণ এমনি অকাট্য যে তার বিরুদ্ধে হাজার যুক্তি আনলেও তা খণ্ডন করা সম্বব নয়।

মোটকথা ইমাম ইবনে তাইমিয়া সব সময় একথা বলে এসেছেন যে, ওহী ও নবুয়াত হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি, বুদ্ধি ও যুক্তি নয়। তাঁর বিভিন্ন কিতাবে তিনি একথা প্রামাণের চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তাঁর এমন কোন বই নেই যেখানে তিনি এ বক্তব্য পেশ করেননি বা অন্তত এর আভাস দেননি। এভাবে তিনি সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিকে কুরআন ও সুন্নাতের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টায় ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারা শক্তিশালী হয় এবং পরবর্তী কয়েকশ বছর পর্যন্ত তা মিল্লাতকে শক্তি যোগাতে থাকে।

শেষ কথা

প্রতিভা মাত্রই বিশিষ্ট। তবুও তার মধ্যে কিছু প্রতিভাকে আমরা আবার বলি কালোত্তীর্ণ। তারা নিজেদের যুগকে অতিক্রম করে গেছে। এমনকি পরবর্তী কালগুলোর ওপরেও তাদের ছাপ অমলিন থেকেছে। এমনি একটি প্রতিভা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহে আলাইহি।

তারুণ্যের প্রথম শিহরণ থেকে শুরু করে বার্ধক্যের স্থবিরত্বের মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ব্যর্থতা ও অপারাগতাকে তিনি কোন দিন স্বীকার করে নেননি। যেন এক অথৈ সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। আবার তরঙ্গ আসছে। অফুরন্ত জীবনী শক্তি তার বুকে। ভাবতে অবাক লাগে ইমামও তেমনি যেন এক সমুদ্র। অফুরন্ত তাঁর হৃদয়ের শক্তি, তার যেন শেষ নেই। স্বদেশে, বিদেশে, সফরে, পথে কোথাও অবস্থানকালে এবং কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায়ও তাঁর মনের জোর ও কর্মশক্তির অফুরান সম্পদ সে দিনের বিশ্বকে চমকিত করেছিল। সাধারণ মানুষ তাঁর হৃদয়ের সন্ধান পেয়েছিল। তিনি ছিলেন তাদের হৃদয় রাজ্যের শাসক।

যুগের গতিধারাকে তিনি কতটুকু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? ইসলামকে তার সঠিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তার সাফল্য কতটুকু? রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তিনি কোন পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন কি না? ইমামের ইসলামী পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। ইসলামের ইতিহাসে ইমামের স্থান নির্ণয়ে এ প্রশ্নগুলো আমাদের সহায়তা করবে।

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন ঃ

مثل امتى مثل المطر لا يدرى اوله خيرام اخره -

অর্থাৎ ' আমার উম্মত হচ্ছে বৃষ্টির মতো, বলা যায় না তার প্রথমাংশ ভালো, না শেষাংশ ভালো।' ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস ইবনে মালিক র. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কাজে উম্মতের যেসব ব্যক্তি নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সবার কৃতিত্ব সমান। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে তাদের কারোর কাজ হয়েছে কারোর চাইতে কঠিন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া কোন্ ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছিলেন। হিজরী সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ইমামের জন্মের পূর্বে তাতারী আক্রমণে মিসর ও সিরিয়া ছাড়া সিন্ধু নদ থেকে নিয়ে ফোরাত নদী পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সমগ্র ভূভাগ

বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই এলাকার যেসব মুসলমান বেঁচে ছিল তারা আবাস পরিবর্তন করতে করতে প্রায় একটি যাযাবর জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অর্থনৈতিক অবনতির সাথে সাথে তাদের সম্মান ও মর্যাদারও অবনতি ঘটছিল। জ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোর ধ্বংসের কারণে তারা যথার্থই ধ্বংসের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন আতংক, অশান্তি ও বিশৃংখলা তাদের জাতিসত্তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। যদিও শেষের দিকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছিল অর্থাৎ তাতারীরা ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু তাতে মুসলমানদের দুর্গতি কতটুকু কমেছিল? এই তাতারী নও মুসলিম শাসকগণ জাহেলিয়াতের ব্যাপারে অমুসলিম শাসকদের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। তাদের শাসনাধীনে এসে মুসলিম জনগণ, আলেম সমাজ, ফকীহ, কাযী ও মাশায়েখগণের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল অনেক বেশি। আলেম সমাজের একটি অংশ জালেমদের খেদমতে নিজেদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছিল।[১] ইজতিহাদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বরং এক অর্থে বলা যায়, গোনাহে পরিণত হয়েছিল। ফিক্‌হ ভিত্তিক মযহাবগুলো এক একটা স্বতন্ত্র দীনে পরিণত হয়েছিল। আল্লামা আবুল আলা মওদুদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তৎকালে অশিক্ষিত ও গোমরাহ জনসাধারণ, দুনিয়া পূজারী ও সংকীর্ণমনা আলেম সমাজ এবং মুর্খ জালেম শাসক শ্রেণীর ত্রয়ী সম্মিলন এমন জোরদার হয়ে ওঠে যে, এই সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে কারোর সংস্কার বা সংশোধনের প্রোগ্রাম নিয়ে অগ্রসর হওয়া কসাইর ছুরির নীচে নিজের গলা বাড়িয়ে দেয়ার চাইতে কিছু কম ছিল না।'[২]

এ প্রেক্ষিতে আমরা বিচার করতে পারি, ইমাম কত বড় ও কত কঠিন কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তিনি কেবল কুরআন ও হাদীস সঞ্জাত যথার্থ ও নির্ভুল ইল্‌ম চর্চার ধারা পুনঃপ্রবাহিত করেননি বরং এই সঙ্গে নবতর সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ইজতিহাদের পথও অবলম্বন করেন। তাঁর ইল্‌ম ও পাণ্ডিত্য ছিল সে যুগে একটি স্বীকৃত সত্যা। তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

এক. তিনি গ্রীক দর্শনের কঠোর সমালোনা করেন। তার সমালোচনার ফলে গ্রীক দর্শনের মুখ থেকে জ্ঞান ও অভ্রান্তির মুখোশ খসে পড়ে এবং তার সব দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। মূলত তার সমালোচনার প্রভাবেই পাশ্চাত্যবাসীদেরও

---

১. অথচ কুরআনে সূরা 'আল কাসাস'-এ আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুখ দিয়ে একথা ব্যক্ত করেছেন ঃ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

"হে আমার রব! তুমি আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছো তার কারণে আমি কখনো কোনো অপরাধী তথা জালেমের সহযোগী হবো না।"

২. তাজদীদে এহ্‌ইয়ায়ে দীন, পৃষ্ঠা ৮১, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫৫ইং লাহোর।

দৃষ্টিসীমা থেকে তমসা সরে যেতে থাকে এবং তারাও এ দর্শনের সমালোচক হয়ে ওঠে তাঁর অনেক পরে হলেও।

দুই. ইসলামী আকীদা বিশ্বাস,বিধি-বিধান ও আইনের স্বপক্ষে তিনি শক্তিশালী যুক্তি উত্থাপন করেন। তাঁর যুক্তি ও বক্তব্য ছিল ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তির ধারক। তিনি গ্রীক পদ্ধতি পরিহার করে সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই ছিল কুরআন ও সুন্নাতের নিকটতর পদ্ধতি।

তিন. অন্ধভাবে কোন ইমামের তাকলীদ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেই কেবল তিনি ক্ষান্ত হননি বরং এই সঙ্গে নিজে ইজতিহাদ করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের জীবন থেকে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন ফিক্‌হ ভিত্তিক মযহাবগুলোর মতবিরোধের স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত পর্যালোচনা করে অসংখ্য নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেন। এর ফলে ইজতিহাদের নতুন পথ আবিষ্কৃত হয়। এই সঙ্গে তিনি শরীয়তের হিকমত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আইন প্রণয়ন পদ্ধতির ওপর সুক্ষ্ম গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর ফতোয়াগুলো এ ব্যাপারে মিল্লাতের একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁর পর যারা ইজতিহাদ করেছেন এবং যারা ভবিষ্যতে করবেন তাদের জন্য তার এ সাহিত্য পথ প্রদর্শকের কাজ করবে।

চার. তিনি বিদআত ও মুশরিকী রীতিনীতির বিরুদ্ধে বলতে গেলে দস্তুরমতো জিহাদ পরিচালনা করেন। এ জন্য মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হন। কিন্তু তার কোন পরোয়াই তিনি করেননি। এ প্রসঙ্গ আলোচনায় আল্লামা আবুল আলা-মওদূদী র. বড় চমৎকারভাবে বলেছেন, 'ইসলামের পরিস্কার ঝরণা ধারায় এ পর্যন্ত যতগুলো অস্বচ্ছ স্রোতের মিশ্রণ ঘটেছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার কোন একটিকেও নিস্কৃতি দেননি। তাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সংগ্রাম চালান এবং প্রত্যেকটিকে ছেঁটে বের করে দিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের পদ্ধতিকে পৃথকভাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করেন।'

প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র ব্যবহারে পিছিয়ে থাকেনি। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকাদ্দমা, হত্যা করার জন্য সশস্ত্র আক্রমণ থেকে শুরু করে রাজরোষে নিক্ষেপ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো পর্যন্ত সব রকমের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সাথে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জালেম শাসকের নাংগা তরবারির নীচে তিনি অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে যান। শাসকের রক্তচক্ষু হক কথা বলা থেকে তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

তাহলে কি নির্দ্বিধার বলা যায়, যুগের গতিধারাকে তিনি পরিবর্তন করতে পারেননি? মোটেই না। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলমানরা যেভাবে চলছিল অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে নিসন্দেহে সেভাবে চলেনি। মুসলমানদের চলার মধ্যে অনেক

পরিবর্তন এসে গিয়েছিলল। এখন তারা মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে চলতে শিখেছিল। তারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল। এখন ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এসবই ছিল বিশেষভাবে একজন আল্লাহর বান্দা একজন মর্দে মুজাহিদেরই কৃতিত্ব। মৃত্যুর পর বিশ্বব্যাপী মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম অধ্যুসিত বিশ্বে তার গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে।

আর ইসলামকে সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কম সংগ্রাম করেননি। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যতদূর সংস্কার সাধন করা সম্ভব তা করার তিনি চেষ্টা করেছেন। এজন্য প্রয়োজনে রাজশক্তির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন আবার কখনো তাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। তবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি এদিকে অগ্রসর হবার মতো কোনো পদক্ষেপও তিনি নিতে পারেননি।

গ্রন্থ পঞ্জী

১. তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড
মওলানা আবুল হাসান আলী নদবী

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া- শায়খ আবু যোহরা (মিসর)

৩. তরীখে ইসলাম- মওলানা আকবর শাহ নাজীবাবাদী

৪. প্রিচিং অফ ইসলাম- টি, ডবলিউ, আরনল্ড

৫. মাসিক উর্দু ডাইজেস্ট লাহোর- ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮

৬. মাসিক তর্জুমানুল কুরআন লাহোর- এপ্রিল, ১৯৩৮

৭. ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়া

৮. তাজদীদ ও এহ্ ইয়ায়ে দীন- মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

৯. খিলাফত ও মূলুকীয়্যাত- মওলানা সইয়েদ আবুল আলা মওদূদী